মনোরমার গৃহ।

শ্রীযুক্ত চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত।

কলিকাতা;
২০১ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, বেঙ্গল মেডিকেল লাইব্রেরী হইতে
শ্রীযুক্ত বাবু গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

সন ১২৯৯ সাল।

 [মূল্য ৶০ আনা।]

উপহার।

এই মরুময় দারুণ সংসার-প্রান্তরে যাঁহারা জীবনের সহযাত্রী হইয়া, নিরন্তর আমার সুখ ও শান্তি বৃদ্ধি করিতেছেন, যাঁহাদের মিষ্ট কথা, সদুপদেশ ও সখ্যভাবের স্নিগ্ধছায়া না পাইলে, আজ যেখানে দাঁড়াইয়া আছি, এখানে দাঁড়াইতে পারিতাম না। ভীষণ দারিদ্র্য, ঘোর নিরাশা, নানা প্রকার অত্যাচার ও উৎপীড়নের তীব্র তাড়নায় বিপর্য্যস্ত হইয়া যখন চারিদিক অন্ধকার দেখি, সেই দুর্দ্দিনে যাঁহাদের প্রসন্ন দৃষ্টি পলকে পলকে জীবন দান করে, যাঁহাদের প্রেম কণায় কণায় বর্ষিত হইয়া নিরাশার অন্ধকারে আশার আলো জ্বালিতে, ঘোর পরিতাপ ও সন্তাপের তীব্র জ্বালায় শান্তি ও সান্ত্বনার স্নিগ্ধ প্রলেপ দিতে নিরন্তর ব্যস্ত, তুমি তাঁহাদেরই একজন। তোমারই কোমল-পবিত্র করকমলে "মনোরমার গৃহ" সাদরে অর্পণ করিলাম।

বিজ্ঞাপন।

"মনোরমার গৃহ" প্রকাশিত হইল। বঙ্গ-ললনাগণ বর্ত্তমান সময়ে কিরূপে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিলে—কিরূপে আত্মীয় স্বজনের সেবা শুশ্রূষা করিলে—কিরূপে অতিথী অভ্যাগতের সেবা ও সমাদর করিলে—দীন দরিদ্র জনের প্রতি কিরূপ সপ্রেম ব্যবহার করিলে, বঙ্গ-গৃহ তৃপ্তিপ্রদ, আরামস্থান, শান্তি-ধাম হইতে পারে, ইহা তাহারই আভাস মাত্র।

সন্তানপালন, সন্তানদের সুশিক্ষাবিধান গৃহস্থের পরম ধর্ম্ম, পিতামাতার অজ্ঞতা ও উদাসীনতাবশতঃ বর্ত্তমান সময়ে বঙ্গীয় বালকবালিকাগণ ভদ্রতা, শিষ্টাচার প্রভৃতি সদ্‌গুণ অর্জ্জনে বঞ্চিত হইয়া উদ্দাম ও উশৃঙ্খল হইয়া উঠিতেছে, তাই মনোরমার গৃহে বর্ত্তমান সময়ের উপযোগী সন্তানপালনের একটী নূতন পদ্ধতি অবলম্বিত হইয়াছে। এবং সে জন্য গৃহের সকল শক্তি, সকল চিন্তা, সকল সামর্থ্য নিয়োগ করা হইয়াছে।

পুস্তকখানি বঙ্গীয় যুবক যুবতীগণের গার্হস্থ্য জীবন গঠনে কথঞ্চিৎ সহায়তা করিলেই পরম লাভ হইল বলিয়া মনে করিব। যাঁহার অমৃতময়ী লেখনী হইতে "প্রভাত-চিন্তা"র পত্রে পত্রে মধু ক্ষরিয়াছে, সেই প্রোথিত-নামা শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত বাবু কালীপ্রসন্ন ঘোষ মহাশয় বর্ত্তমান পুস্তক সম্বন্ধে তাঁহার পত্রে লিখিয়াছেনঃ—"আমার নিকট যে অংশ আসিয়াছে, শীঘ্র তাহার আদ্যোপান্ত দেখিব, মুদ্রণ অতি সুন্দর হইয়াছে, যে দুই-এক স্থান পড়িয়াছি, তাহাতে বিশেষ প্রীতিলাভ করিয়াছি।" ইহাই আমার পরিশ্রমের যথেষ্ট পুরস্কার। সাহিত্য-সংসারে তাঁহার ন্যায় সুপরিচিত মহোদয়ের "বিশেষ প্রীতি" উৎপাদন করিবার শক্তি আমার নাই। তথাপি যে তাঁহার প্রীতিলাভ হইয়াছে, ইহাতেই আমি কৃতার্থ হইয়াছি।

London National Indian Association এর সম্পাদিকা কুমারী শ্রীমতী ই, এ, ম্যানিং বর্ত্তমান পুস্তকখানি প্রকাশিত হইতেছে শুনিয়া আনন্দিত হইয়া লিখিয়াছেনঃ—You have a gift for writing such

books. I hope you will go on using it. স্বদেশ বিদেশের সাহিত্যানুরাগী মহোদয়গণের এই সকল উৎসাহ বাক্য এবং নানাপ্রকার সাহায্য প্রাপ্তিই আমার ক্ষুদ্র চেষ্টার যথেষ্ট সমাদর মনে করিয়া আমি আমার উৎসাহদাতাগণের নিকট এবং সর্ব্বোপরি সর্ব্বফলদাতা ভগবানের নিকট কৃতজ্ঞ।

বর্ত্তমান পুস্তকখানি আমার পূর্ব্ব প্রণীত দুখানি ছবির অনুক্রম (sequel)। কিন্তু এরূপভাবে লিখিত যে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ভাবেও পড়া যাইতে পারে, কিন্তু যাঁহারা দুখানি ছবি পড়িয়াছেন তাঁহাদের নিকট এ পুস্তক আরও মনোরম হইবার সম্ভাবনা। দুখানি ছবি সম্বন্ধে সময় বলিয়াছেন:—"অতি সুন্দর হইয়াছে" সঞ্জীবনীবলিয়াছেন "বিধবা প্রেমমালাকে তিনি দেবী করিয়াছেন।" হোপ বলিয়াছেন "beautiful little novel"। এরূপ আরও অনেক সুন্দর সুন্দর অভিমত ব্যক্ত হইয়াছে। সুতরাং তাহারই উপসংহার মনোরমার গৃহ-ধর্ম্ম বঙ্গীয় পাঠক মণ্ডলীর নিকট বিশেষভাবে আদৃত হইবে আশায় ইহাকে তাঁহাদের স্নেহ-ক্রোড়ে অর্পণ করিলাম।

৪২ পৃষ্ঠায় ১০ম পরিচ্ছেদের ৮ম পঙক্তিতে "কর্ম্মজ্ঞান"এর স্থানে "কর্ম্মফল" হইবে।

৫৬।১ সুকিয়া ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
১লা আশ্বিন ১২৯৯।

শ্রীচণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

মনোরমার গৃহ।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

পুষ্পোদ্যানে।

একি বনদেবতা! এ সুন্দর ছবি কে রচনা করিল? এমন স্থানে, এমন সময়ে, এমন ভাব ত সচরাচর ঘটে না! এ প্রফুল্ল মুখকমল যে দেখিয়াছি বলিয়া মনে হয়। চিনিয়াও চিনিতে পারিতেছি না—মনে আসিয়াও আসিতেছে না! কি বিপদ, এযে চেনা লোক! না, যদি পরিচিত লোক হবেন, তবে এমন সময়ে, এমন স্থানে তিনি কি করিয়া আসিবেন? এমন সুন্দর সময়ে এমন মধুর নূতন বসন্ত বায়ু-বিতাড়িত পুষ্পোদ্যানে তিনি কি করিয়া আসিবেন? সান্ধ্যসমীরণ মৃদুমন্দ প্রবাহিত হইয়া প্রস্ফুটিত কুসুমরাজিকে দোলাইতেছে, নাচাইতেছে, হাসাই-তেছে—শেষে তাহাদের যথাসর্ব্বস্ব হরণ করিয়া তাহাদিগকে কাঁদাইতেছে—তাহাদের সৌরভরাশি আত্মসাৎ করিয়া নিজে মিষ্ট হইতেছে। বসন্তবালা! তুমি বড় দুরন্ত, একে তুমি, তাতে আবার কুসুমসনে খেলা ক'রে জিতে এসেছ—পরের ধনে নিজে সেজেছ—তাই আরও একটু বেশী চঞ্চলতার পরিচয় দিতেছ। ঐযে তোমার তাড়নায় ফুলকুল মাথা নাড়িয়া বলিতেছে আর না—আমার কাছে এসনা—আমি আর পারিনা। ঐযে তোমার সাদর সম্ভাষণে যুবতীর কেশভার দুলিয়া দুলিয়া মুখের উপর পড়িতেছে, আর তিনি মাঝে মাঝে নিজের কাজ ফেলিয়া সেই বিপর্য্যস্ত

কেশরাশিকে যথাস্থানে বিন্যস্ত করিতেছেন, আর কল্পিত কোপ-ভরে তোমাকে ভর্ৎসনা করিতেছেন, তুমি সুযোগ পাইয়া মনের সাধ মিটাইয়া খেলা করিতেছ। তোমারই জিত! সেই পরিমল-তরঙ্গের মধ্যস্থলে একখানি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন লৌহাসনে উপবেশন পূর্ব্বক যুবতী ফুলের মালা গাঁথিতেছেন। সে প্রসন্নতাপূর্ণ চক্ষের আনত দৃষ্টি—সে মগ্ন মনের একাগ্রতার ভাব—সে শান্তি ও কোমল-তার সম্মিলন কে চিত্র করিবে? যিনি এ দৃশ্য রচনা করিয়াছেন তিনি ভিন্ন অন্য কাহারও তুলিতে সে চিত্র সম্ভবে না। কাহারও সাধ্য নাই যে, সে দেবভাব অঙ্কিত করে। এমন পবিত্র শোভা সকল সময়ে ফুটে না, আবার ফুটিলেও লোক দেখিবার দোষে ইহার গাঢ় মাধুর্য্য সম্ভোগ করিতে পারে না। অপবিত্রতার ভিতরে, পাপানুষ্ঠানের গাঢ় অন্ধকারের ভিতরে, মানুষ যতক্ষণ ডুবিয়া থাকে ততক্ষণ সে স্বর্গে নরক—অমৃতে মৃত্যু—হরিষে বিষাদ ঘটায়; তাহার দোষে শাদা কাল হয়—ভাল মন্দ হয়—সুখ দুঃখে পরিণত হয়। আবার সেই অভাগা কৃপাপাত্র যদি কোন প্রকারে সাধুতার সুবাতাসের ভিতরে পড়ে—পবিত্রতার প্রখর অগ্নি যদি একবার তাহার প্রাণে জ্বলিয়া উঠে, সে এই চাতুরিপূর্ণ সংসারেই স্বর্গের শোভা দেখিতে পায়—তাহার নিকট সৌন্দর্য্য পবিত্রভাব ধারণ করে। মনের এইরূপ অবস্থায় লোক স্বর্গের ছবি দেখিতে পায়—দেখিতে পায় সত্য, কিন্তু আঁকিয়া দেখাইতে পারে না।

আবার এ কি! চারি বৎসরের এক শিশু—চম্পকের কান্তি—কমলের শোভা—গোলাপের সৌরভ একত্র করিয়া বিধি সে শিশুকে গঠন করিয়াছেন বলিয়া বোধহয়, তা নাহ'লে, সে এমন কোমল, এমন সুন্দর, এমন নির্ম্মল কি ক'রে হবে? শিশু প্রস্ফুটিত কুসুমরাশির ভিতরে মিশিয়া গিয়াছে। সে ফুটন্ত ফুলগুলি একে একে চয়ন করিয়া মায়ের নিকট আনিতেছে। সন্তান এক গাল

হাসি হাসিয়া হাসিভরাফুলগুলি মায়ের সম্মুখে রাখিতেছে। জননী স্নেহপূর্ণ দৃষ্টিতে সন্তানের দিকে তাকাইয়া একটু হাসিতেছেন, আর স্নেহভরে শিশুর কোমল মুখে বার বার চুম্বন দিতেছেন। শিশু তাহাতেই সন্তুষ্ট হইয়া, তাহাকেই যথেষ্ট পুরস্কার মনে করিয়া সানন্দচিত্তে আবার সেই শোভারাশির ভিতর ডুবিয়া যাইতেছে। আজ মাঘের বিংশতিতম দিবস হইলেও, শীতের প্রকোপ কমিয়াছে, নূতন বসন্তের মৃদুমন্দ হিল্লোলে প্রাণ নাচিয়া উঠিতেছে। ক্ষণকাল মধ্যে এ দৃশ্যের শোভা আরও বৃদ্ধি হইল। আকাশে পূর্ণচন্দ্র উদয় হইল। অসংখ্য নক্ষত্র পরিশোভিত আকাশে পূর্ণচন্দ্র, আর নানা বর্ণের কুসুমনিচয়ের মাঝারে শিশু বসন্তের চাঁদ সাজিয়া খেলা করিতেছে। আকাশের শোভা উদ্যানে—উদ্যানের শোভা আকাশে প্রতিবিম্বিত হইয়া পরস্পারের সহিত প্রতি-যোগিতা করিতেছে। আজ নরলোকে দেব লোক— পুষ্পো-দ্যানে স্বর্গের শোভা দেখা দিয়াছে—আজ উদ্যানের প্রস্ফুটিত কুসুমরাশির মাঝারে অকলঙ্ক শিশু আকাশের পূর্ণচন্দ্রকে পরাজয় করিয়াছে।

একে একে তিন ছড়া মালা গাঁথা হইল। তিন গাছিই দেখিতে বেশ সুন্দর, আর তাহার সৌরভে চারিদিক আমোদিত করিয়াছে। দুগাছি বেশ বড় আর এক গাছি অপেক্ষাকৃত একটু ছোট। মালা প্রস্তুত হইলে বনদেবতা স্থিরভাবে বসিয়া কি চিন্তা করিতে লাগিলেন। তাঁহার মুখের ভাব দেখিয়া বোধ হইতেছে, তিনি যেন তাঁহার জীবনের অতীত ঘটনা সকল আজ স্মরণ করিতেছেন। কোথায় ছিলেন—কিরূপে কোন্ পথে—কোন্ অল-ক্ষিত শক্তির সাহায্যে এই সুখের অবস্থায় আসিয়াছেন—যে সকল সুখকে কখন মনে স্থান দেন নাই—কল্পনাতেও সম্ভোগ করেন নাই—স্বপ্নেতেও উপলব্ধি করেন নাই, বুঝিতে পারিতেছেন না,

দুঃখিনী হইয়া কোন্ পুণ্য বলে—কাহার করুণায় এমন অবস্থায় আসিলেন, অতীতের দুঃখ কষ্ট এবং বর্ত্তমানের সুখ ঐশ্বর্য্য তুলনা করিয়া নিজে নিজে অতি বিনীতভাবে অজ্ঞাতসারে সেই মঙ্গলময়ের চরণে প্রণত হইলেন। শিশু আসিয়া শান্ত ভাবে মায়ের নিকট বসিয়াছে। তাহার মুখে একটি কথা নাই। নীরবে মায়ের মুখের দিকে তাকাইয়া আছে। মায়ের মুখের ভাব দেখিয়া তাহার কিছু বলিতে সাহস হইতেছে না, বলিতে ইচ্ছাও নাই। শিশু মায়ের মুখে কি এক শোভা দেখিতে পাইয়াছে, তাহাই দেখিতেছে, কিন্তু সে জানে না কেন দেখিতেছে—আর কেনইবা দেখিতে ইচ্ছা হইতেছে—কেনইবা দেখিতে ভাল লাগিতেছে।

এমন সময়ে ধীর অথচ উৎসাহপূর্ণ—গম্ভীর অথচ কার্য্যকুশল, এক সুন্দর যুবাপুরুষ ধীরে ধীরে সেই খানে আসিলেন। ইনি যে ঐ বনদেবতার হৃদয়বিহারী প্রিয়তম স্বামী,একথা বলিবার পূর্ব্বেই শিশু পিতাকে দেখিয়া সত্বরপদে তাঁহার দিকে অগ্রসর হইয়া বলিতেছে "বাবা, আমি আজ অনেক ফুল তুলিছি—আর মা ফুলের মালা গেঁতেছেন, বাবা তুমি দেখ্‌বে? বাবা একছড়া মালা নেবে?" পিতা পুত্রের মিষ্ট কথায় বাহিরের চিন্তা ভুলিয়া গেলেন। পুত্রকে স্নেহভরে ক্রোড়ে লইয়া ঘন ঘন চুম্বন দিতে লাগিলেন। পুত্র পিতার গলা জড়াইয়া আধ আধ মিষ্ট কথায় মনের কত ভাবই প্রকাশ করিতে লাগিল। পিতা পুত্রকে ক্রোড়ে লইয়া ধীরে ধীরে গৃহিণীর নিকটস্থ হইলেন। নিকটে আসিয়া দেখেন, সে সুন্দরী আজ স্বর্গের শোভা ধারণ করিয়াছেন। গৃহিণী বনদেবতার বেশে সেখানে বিরাজ করিতেছেন। সে ভাব, সে শোভা দেখিয়া তাঁহার প্রেমপূর্ণ হৃদয় মুগ্ধ হইল, তিনি আস্তে আস্তে সহধর্ম্মিণীর নিকটে বসিলেন। সে কমনীয় কান্তি সে সরলতার ছবি আজ দেবভাব ধারণ করিয়াছে দেখিয়া তিনি আপনাকেই

ধন্য মনে করিতে লাগিলেন। বিধাতা কৃপা করিয়া এমন নারীরত্ন মিলাইয়া দিয়াছেন ভাবিয়া তাঁহার হৃদয় আর্দ্র হইল, তিনি ভগবানকে স্মরণ করিয়া মনে মনে শত বার ধন্যবাদ দিতে লাগিলেন। এমন সময়ে রমণী ধীরে ধীরে গাহিতে লাগিলেনঃ—

কে তুমি কাছে ব'সে থাক সর্ব্বদা আমার,
স্বভাব প্রকৃতি রীতি, মিষ্ট অতি,
কি নাম বল তোমার।
প্রতিদিন এত ক'রে, কেন ভালবাস মোরে,
দয়াতে পূর্ণ হয়ে, কর কেবল উপকার।
রূপে গুণে অনুপম, দেখিনাই কোথা এমন,
মধুর আকর্ষণে, প্রাণ টানে, তোমার পানে, বারেবার।
নাই আলাপ, নাই পরিচয়, দেখিলে মন মোহিত হয়,
চিনেও চিনিতে নারি, একি দেখি চমৎকার।
সম্বন্ধে কে হও তুমি, জনক কিম্বা জননী,
যে হও সে হও তুমি, তুমি আমার আমি তোমার॥

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

জনশূন্য প্রান্তরে।

পিতা পুত্রে নীরবে গান শুনিতে ছিলেন। সঙ্গীত শেষ হইলে পর মনোরমা একটি দীর্ঘ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া স্বামীর চরণে ধরিলেন। শরৎচন্দ্র অতি মিষ্ট ভাবে মনোরমাকে চরণ ছাড়িতে বলিলেন। কিন্তু মনোরমা তাহাতে কর্ণপাত না করিয়া বলিলেন—বিধাতা তোমাকে দিয়া আমাকে এত সুখী করিবেন আমিত

* রাগিণী ঝিঁঝিট—তাল পোস্তা।

স্বপ্নেও জানিতাম না। আমি দুঃখিনী আমার ভাগ্যে এত সুখ কেন? আর তুমি আমাকে জ্ঞান ধর্ম্মে তোমার উপযুক্ত করিয়া, তোমার ভালবাসা, প্রেম ও মহত্বের পরিচয় দিয়াছ, আজ তোমার চরণ স্পর্শ করিতেছি, ইহাতে আমার যে কত সুখ, কত আনন্দ হইতেছে তাহা কি তুমি বুঝ না? তোমাকে পাইয়া আমার জীবনের মূল্য হইয়াছে, আমি তোমার চরণে ধরিব না? আজ পাঁচ বৎসর পূর্ণ হইতে চলিল, এই দিনে বিধাতা তোমাকে আমাকে একত্র করিয়াছিলেন। আজ সেই দিন, আজ তোমাকে আর আমি কি দিব? তোমার চরণ ছাড়িয়া দিলাম। অনেক পরিশ্রমে আজ এই তিন ছড়া মালা গেঁথেছি, তুমি গ্রহণ করিলে, আমি পরম সুখ অনুভব করিব।

শ। কেন আমি মালা নিয়া কি করিব?

ম। আমি অনেক যত্নে গেঁথেছি, তুমি নিলে, তোমার ইচ্ছামত ব্যবহার করিলে, আমি দেখিয়া চক্ষু স্বার্থক করি, আমার প্রাণ জুড়াই।

শরৎচন্দ্র হাসিতে হাসিতে মালা গ্রহণ করিয়া আপনার ইচ্ছামত ব্যবহার করিলেন। মনোরমা বহুক্ষণের শ্রম সফল হইল দেখিয়া আনন্দাশ্রু-প্লাবিত মুখে নত দৃষ্টিতে বসিয়া রহিলেন। বালক বসন্ত কুমার ইতিপূর্ব্বে একছড়া মালা পাইয়া নাচিতে নাচিতে তাহার দিদিমায়ের নিকট চলিয়া গিয়াছে, সে দিদিমাকে এই পুরস্কার প্রাপ্তির সংবাদটি দিবার জন্য বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করিয়াছে। মনোরমা ও শরৎচন্দ্র দুই জনে বসিয়া নানা প্রকার কথা বার্ত্তা কহিতে লাগিলেন।

ক্ষণকাল পরে মনোরমা বলিলেন দেখ আজ তোমায় দেখিবার জন্য প্রাণটা বড়ই আকুল হইয়া উঠিয়াছিল। কেন জানি না, নানা প্রকার অশুভ কল্পনা মনে উদয় হইতেছিল। মাঝে মাঝে হৃদয়

কাঁপিয়া উঠিতেছিল, আর কেমন যেন চারিদিক অন্ধকার বোধ হইতেছিল। কেন এমন হয় বলিতে পার ?

শরৎ বলিলেন, দেখ, যেখানে ভালবাসা অক্ষুণ্ণভাবে বিরাজ করে, সেই খানেই লোকে তিলকে তাল করে। দেখিতে পাইবার সময় অতীত হইতে না হইতে চিত্ত চঞ্চল হইয়া উঠে, কাজে কাজেই লোক প্রিয়জনকে দেখিতে না পাইয়া আকুল হইয়া উঠে, শুভাকাঙ্ক্ষার সুমিষ্ট ভাব সর্ব্বদা যে প্রাণ অধিকার করিয়া রাখে, অশুভ কল্পনার তাড়না সেইখানেই প্রবল হয়। এইরূপ অমঙ্গল চিন্তার উত্তেজাপূর্ণ মন নানাপ্রকার বিষাদ-ময় চিত্র অঙ্কিত করে—সে দৃশ্যে নিজে নিজে চমকিত হয় এবং সেই জন্য চারিদিক অন্ধকার দেখিয়া থাকে। মনোরমা বলিলেন তবে কি ইহার মধ্যে কোন অর্থ নাই ? শরৎ বলিলেন অধিকাংশ স্থলে কল্পনার প্রাবল্যে এরূপ জল্পনার সৃষ্টি হইয়া থাকে, কিন্তু কখন কখন কিছু অর্থ থাকিলেও থাকিতে পারে, যেমন আজ-কার ঘটনা। মনোরমা ভয়-বিস্ময়-বিজড়িত ভাবে সিহরিয়া উঠিলেন—অবাক্ হইয়া স্বামীর মুখের দিকে তাকাইয়া রহি-লেন। সে উৎকণ্ঠা ও ভীতিব্যঞ্জক মুখের ভাব দেখিয়া শরৎ বুঝিলেন যে মনোরমা সমস্ত ঘটনা শুনিবার জন্য ব্যস্ত হইয়াছেন, কিন্তু কথা কহিবার সামর্থ্য নাই, শরীর মন অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছে। শরৎচন্দ্র বলিলেন, দাদামহাশয় উইল করিবার জন্য আমাকে ডাকিয়া ছিলেন। সমস্ত কার্য্য শেষ করিয়া আসিবার সময় আজ বড় বিপদে পড়িয়াছিলাম, কেবল ভগবানের কৃপায় সে বিপদে উদ্ধার পাইয়া আসিয়াছি। আজ শনিবার, বাজারে যতগুলি গাড়ী থাকে, সব ষ্টেসনে আসিয়াছে, আমি আসি-বার সময়ে একখানিও গাড়ী পাইলাম না। দাদা মহাশয়ের বাড়ী হইতে ষ্টেসন পর্য্যন্ত ছয় মাইল পথ হাঁটিয়া আসিতে হইল।

বাজারে আসিয়া যখন গাড়ী পাইলাম না, তখন আবার ফিরিয়া গিয়া চাকর ও আলো সঙ্গে লইবার সময় ছিল না, কারণ তাহা হইলে আবার ষ্টেসনে আসিয়া গাড়ী পাইনা; চারিদিক ভাবিয়া একাই ষ্টেসনের দিকে অগ্রসর হইলাম। তখন আর বেলা নাই,—লোক জন পথ ঘাট ও মাঠ ছাড়িয়া নিজ নিজ গৃহের দিকে চলিয়াছে, এমন সময়ে আমি মধ্যপথে সেই চট্‌কার মাঠে আসিয়া পড়িয়াছি। পূবের আকাশে চাঁদ উঠিলেও দূরের বড় বড় বৃক্ষের অন্তরালে তখনও লুকাইত; সম্মুখে অনেক দূরে সমুদায় মাঠ চাঁদের আলোতে কেবল হাসিতে আরম্ভ করিয়াছে মাত্র। একটী বটবৃক্ষতলে দুইজন লোক বসিয়া কি পরামর্শ করিতেছিল, আমাকে দেখিয়া দুজনেই একটু জড়সড় হইল, আমি যেন দেখিয়াও দেখিলাম না, সত্বর পদে সম্মুখের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলাম। খানিক দূর আসিয়া আমার কি ভাব হইল—একবার পশ্চাৎ দিকে তাকাইলাম, তাকাইবা মাত্র (আমার বলিতে এখনও গায়ে কাঁটা দিতেছে,সমস্ত শরীর অবশ হইয়া আসিতেছে) দেখিলাম বড় ভয়ানক বিপদ। সেই দুজন লোক নিঃশব্দে আমার পশ্চাৎ ধাবিত হইয়াছে—এমন চুপে চুপে, অথচ এত দ্রুত গতিতে আমার সঙ্গ লইয়াছে যে সেরূপ অভ্যাস না থাকিলে, কখনই তেমন ভাবে আসিতে ততদূর কৃতকার্য্য হইতে পারে না। আমি তাকাইয়া দেখি যে তাহাদের দুইজনের একজন আমার অতি নিকটে আসিয়া ভীমের গদা সদৃশ সেই প্রকাণ্ড লাঠিগাছি আমার মাথার উপর তুলিয়াছে, আর এক মুহূর্ত্ত হইলে সেই বিশাল দেহ রাক্ষস হস্তে তৎক্ষণাৎ নিধন প্রাপ্ত হই—সেই লাঠিগাছি—আমাকে তৎনই ভূমিসাৎ করে। মনোরমা এতক্ষণ অবাক হইয়া স্বামীর মুখের দিকে তাকাইয়া সমস্ত শুনিতেছিলেন, এখন আর স্থির থাকিতে পারিলেন না, শরতের বলিবার ধরণে মনোরমার বোধ

হইল যেন তিনি সম্মুখে সেই দৃশ্য দেখিতেছিলেন, তিনি কাতর-কণ্ঠে বিকট-শব্দ করিয়া নিজের অঞ্চলে সেই পূর্ণিমার জ্যোৎস্না-বিধৌত মুখমণ্ডল আবৃত করিলেন। শরৎচন্দ্রের বোধহইল যেন চারিদিক অন্ধকারে ঢাকিয়াছে—মনোরমা ক্ষণকালের জন্য সংজ্ঞাশূন্য ও স্পন্দরহিত হইয়া, যেন প্রতিমূর্ত্তির ন্যায় বসিয়া রহিলেন। শরৎচন্দ্র প্রেমসম্ভাষণ দ্বারা প্রিয়তমার অবসন্ন ভাব দূর করিলেন, ক্রমে তাঁহার সে উত্তেজনা ও হৃদয়ের আবেগ প্রশ-মিত হইলে পর মনোরমা আস্তে আস্তে জিজ্ঞাসা করিলেন কি করিয়া সে দস্যু হস্তে রক্ষা পাইলে? তখন স্বামী বলিলেন—প্রাণ যায় দেখিয়া আমি ফিরিয়া দাঁড়াইলাম, আমার বোধ হইল যেন পলক মধ্যে আমি শত সিংহের বল ধারণ করিলাম। এক লক্ষে তাহার সেই লাঠিগাছি ধরিলাম—ধরিয়া সবলে এক টান দিলাম। সে ব্যক্তি আমার সঙ্গে দ্রুত চলিতে ক্লান্ত হইয়াছিল, যেমন লাঠি ধরিয়া টান দিলাম, অমনি তাহার লাঠি আমার হইল। সেই লাঠি লইয়া আমি উন্মত্তের ন্যায় তাহার প্রতি সেই লাঠির সদ্ব্যবহার আরম্ভ করিতে না করিতে, অপর ব্যক্তি আসিয়া আমাকে আক্রমণ করিল। আমি দুঘা খাইয়াছি, তাহাকেও দু চারি ঘা দিয়াছি, এমন সময়ে একটু দূরে শব্দ শুনিয়া বোধ হইল, ষ্টেসন হইতে গাড়ী আসিতেছে। এই গাড়ীর শব্দ সেই দস্যুদ্বয়ের সম্পূর্ণরূপে বল ক্ষয় করিল, তাহারা পালাইবার চেষ্টা করিতেছে, এমন সময়ে আমি তাহাদের একজনকে ধরিলাম, কিন্তু কাপড় ধরিয়াছিলাম, কাপড়ের যে অংশ ধরিয়াছিলাম সেই অংশটুকু আমার হাতে রহিল, সে ব্যক্তি তখন প্রাণভয়ে পলায়ন করিল। গাড়ী একে একে দু তিন খানি আসিয়া উপস্থিত হইল, গাড়ীর জনৈক চালক নামিয়া তাহা-দিগকে দূরে পালাইতে দেখিতে পাইল, কিন্তু তখন তাহারা এত দূরে গিয়াছিল যে আর ধরা পড়িবার কোন সম্ভাবনা ছিল না।

সকলে সমবেত হইয়া একখানা গাড়ী আমাকে ছাড়িয়া দিলেন। আমি সেই গাড়ী লইয়া ষ্টেসনে পৌঁছিলাম, আমার সঙ্গে যে টাকা গুলি ছিল, তাহা খুব সাবধানে বাঁধিয়া রাখিয়াছিলাম বলিয়া তাহারা কিছু নিতে পারে নাই। দাদামহাশয় তোমার নামে কোম্পানীর কাগজ ক্রয়ের জন্য আজ আবার আমাকে একহাজার টাকা দিয়াছেন। মনোরমা ব্যস্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন কোথায় লাগিয়াছে দেখি। শরৎ একটু হাসিয়া বলিলেন—আমার লাগিলে কি আর হাসিতে হাসিতে আসিয়া তোমার নিকটে বসিতে পারিতাম, না তোমার বীণানিন্দিত কোমল কণ্ঠনিঃসৃত গীতলহরীতে শ্রবণ জুড়াইতে পারিতাম? আমার শরীরে আঘাত লাগে নাই, কেবল এই বাঁহাতের নীচে, এই খানে একটু চোট লাগিয়াছে, বাড়ী আসিয়া আর্ণিকালোশন দিয়া আসিয়াছি, এখন আর বেদনা নাই। মনোরমা বলিলেন—তবে চল ঘরে যাই, এত পরিশ্রান্ত শরীরে আর এখানে বসিয়া কষ্ট পাইবার প্রয়োজন নাই। শরৎ বলিলেন—আজ বাড়ী আসিয়া তোমাকে দেবীবেশে কুসুমকাননে বিহার করিতে দেখিয়া এবং তোমার সেই স্বর্গীয় দেবভাবের সংস্পর্শে আসিয়া শরীরের সমস্ত গ্লানি ও যন্ত্রণার অবসান হইয়াছে, তবে এখন কেন উঠে যাব? তোমার কি ভাল লাগিতেছে না?

মনোরমা বলিলেন—আমার বড়ই ভাল লাগিতেছিল, আজ পূর্ণিমার রাত্রি, চারিদিক যেন হাসিতেছে, ফুলগুলি ফুটে বাগানটী কেমন আলো করেছে, তুমি যখন আসিলে, তখন তোমার আগমনে আমার ক্ষুদ্র হৃদয় নৃত্য করিয়া উঠিল। আজ পূর্ব্ব স্মৃতি পূর্ণরূপে প্রাণে জাগিয়া উঠিয়াছে—আজ এই পাঁচ বৎসরের প্রথম দিনের প্রথম মুহূর্ত্ত হইতে আরম্ভ করিয়া এ ক্ষুদ্র জীবনের সমস্ত ঘটনাই একে একে স্মৃতিপথে উদিত হইল, তোমার নখাগ্র হইতে কেশাগ্র পর্য্যন্ত সমস্তই যেন সুন্দর—মনোহর বলিয়া বোধ হইতে

লাগিল, তোমাকে দিব্য কান্তিপরিশোভিত দেবতা বলিয়া মনে হইতে লাগিল, তুমি আজ আমার সুখের পথে কেন শত্রু হইলে? তোমার কি করিছি যে তুমি আমার অক্ষুণ্ণ তৃপ্তি সম্ভোগের ব্যাঘাত জন্মাইলে? নিজ কণ্ঠ হইতে ফুলের মালাছড়া লইয়া প্রিয়তমের হাত দুখানি বাঁধিয়া, হাসিতে হাসিতে বলিলেন আজ তোমায় বাঁধিয়া রাখিব।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

জীবনের উন্নতি পথে।

মনোরমা শরৎচন্দ্রের গৃহলক্ষ্মী, মনোরমার সহিত শরতের বিবাহ হওয়ার পর হইতেই শরতের সৌভাগ্য-সূর্য্য প্রসন্নভাব ধারণ করিয়াছে—সে সুখ-রবি দিন দিন উজ্জ্বলতর ভাবে কিরণ বিতরণ করিতে আরম্ভ করিয়াছে। বিবাহের পর প্রথম প্রথম তাঁহার জীবনে নানাপ্রকার পরীক্ষা আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিল সত্য, যে স্থানে কর্ম্ম করেন, সেখানকার বড় বাবু সমাজ-সংস্কারবিরোধী লোক বলিয়া অনেক সময়ে বিনা কারণে তাঁহার নানা প্রকার ক্লেশের কারণ উপস্থিত হইত। অন্যান্য বাবুরাও বড়বাবুর প্রসন্ন দৃষ্টির আশায় প্রলুব্ধ হইয়া তাঁহার প্রতি নানাপ্রকার অভদ্র ব্যবহার করিতেও ত্রুটি করেন নাই; কথা বার্ত্তার ভাব ভঙ্গিতে, চলা ফেরাতে যেন একটা ঘৃণার ভাব, বিদ্বেষের ভাব, শত্রুভাব প্রকাশ পাইত। শরৎচন্দ্র অতি শান্ত ও ধীর প্রকৃতির লোক হইলেও অন্যায় কথা, অকারণসম্ভূত কুব্যবহার, হিংসা ও শত্রুতাচরণের প্রশ্রয়দাতা হইতে পারিতেন না। সর্ব্বদাই এই সকল ব্যবহারের বিরুদ্ধে তাঁহার কথা কহিতে হইত। এজন্য তিনি আরও অপ্রিয় হইয়া পড়েন।

বৃদ্ধ মাতামহ এক্ষণে পেনসন প্রাপ্ত হইয়া গৃহে বসিয়া আছেন। তিনি নিষ্ঠাবান হিন্দু, বহুকাল ধরিয়া শরীরের শোণিত বিন্দু বিন্দু পাত করিয়া সংসারের সেবা করিয়াছেন, বহু ক্লেশ স্বীকার করত আত্মীয় স্বজন ও অন্যান্য দরিদ্র সন্তানদিগকে প্রতিপালন করিয়াছেন, এক্ষণে সংসারের কর্ম্মকাজ হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া সর্ব্বদা ধর্ম্মচিন্তা ও শাস্ত্রালাপে কালাতিপাত করেন। বেশ বড় চাকুরি করিতেন। শরৎচন্দ্র যে আফিসে কর্ম্ম করেন, সে আফিসের সাহেব-কর্ত্তাদের সঙ্গে তাঁহার আত্মীয়তা ছিল। তিনিই শরতের আফিসের কর্ত্তা-সাহেবের নিকট এক পত্রসহ তাঁহাকে পাঠাইয়া দেন। যাইবা মাত্র শরতের পঞ্চাশ টাকা বেতনের কর্ম্ম হইয়াছিল। সাহেবের সঙ্গে সর্ব্বদা দেখা সাক্ষাৎ হওয়াতে সাহেব শরৎকে বেশ বুদ্ধিমান ও শিক্ষিত লোক বলিয়া জানিতেন। তাঁহার কর্ম্ম কাজেও বেশ সন্তুষ্ট ছিলেন, কিন্তু বড়বাবু ক্রমে সাহেবের কান ভারি করিয়া তুলিতে ছিলেন, এইটী বুঝিতে পারিয়া শরৎ একবার দাদামহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ করেন এবং আফিসের সমস্ত ঘটনা তাঁহাকে বলেন। শরতের দাদামহাশয় বিধবা বিবাহের পক্ষপাতী না হইলেও, শরৎকে অত্যন্ত স্নেহ করিতেন এবং তাঁহাকে সৎ ও ধার্ম্মিক লোক বলিয়া তাঁহার ধারণা ছিল। এইজন্য এই সংবাদ প্রাপ্তে অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হইয়া শরতের সাহেবকে একখানা পত্র লিখিয়া দেন এবং বলিয়া দেন যে ইহাতে যদি কিছু সুবিধা না হয়, তাহা হইলে তিনি নিজে একবার কলিকাতায় গিয়া অন্য কোন সাহেব-বন্ধুর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহার ভাল কর্ম্ম কাজের সুবিধা করিয়া দিয়া আসিবেন। সেই পত্র লইয়া শরৎচন্দ্র সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করাতে, সাহেব সমস্ত ব্যাপার বুঝিতে পারিয়া শরৎচন্দ্রকে বলেন—বাবু, তোমাদের আপনাআপনির মধ্যে এত গোলযোগ তা ত আর

আমি জানিতাম না, এই সকল লোক যে এত ক্ষুদ্রমনা, তাহা আমি বুঝি নাই, আচ্ছা তোমার কোন চিন্তা নাই, আমি তোমার কাজ-কর্ম্মের প্রতি দৃষ্টি রাখিব, আর সুবিধা হইলে শীঘ্র তোমার ভাল করিয়া দিব। এইসূত্রে তিনি ক্রমশঃ পঞ্চাশ টাকা হইতে এক্ষণে ২০০ টাকা বেতনের কর্ম্মে নিযুক্ত হইয়াছেন, এখন বড় বাবুও অনেক সময়ে তাঁহার কৃপার ভিখারী হন, আফিসের সেই সকল বাবুরাই এখন আবার বিধবা বিবাহের উৎসাহদাতা, শরৎচন্দ্রের প্রিয় অনুচর হইবার জন্য লালায়িত। মাতামহ কৃষ্ণগোবিন্দ ঘোষ কলিকাতায় আসিয়া সর্ব্বদাই আমাদের পূর্ব্ব পরিচিত রামগোপাল বাবুর বাসাতেই থাকিতেন; কারণ বৃদ্ধ তাঁহার খুল্ল পিতামহ এবং তাঁহাকে শৈশবকাল হইতে মানুষ করিয়াছেন, এবং নিজেই তাঁহার কর্ম্ম কাজ করিয়া দিয়াছেন। শরতের বিবাহ হওয়ার পর আর সেখানে আসিতে সম্মত হন নাই, এবার অনেক পীড়াপীড়ির পর আসিয়াছেন। শরৎ সপরিবারে সেই বাড়িতেই থাকিতেন, সুতরাং এতদিন শরতের যে বাসনাটী অপূর্ণ ছিল, তাহা পূর্ণ হই-বার সুযোগ উপস্থিত হইল। বৃদ্ধ বসিয়া বিশ্রাম করিতে করিতে রামগোপালবাবুর সহিত নানা বিষয়ে আলাপ করিতেছিলেন, এমন সময়ে মনোরমার মা বস্ত্রালঙ্কারে সজ্জিত করিয়া কন্যাকে বৃদ্ধ দাদাশ্বশুরের সম্মুখে আনিতেছেন দেখিয়া, রামগোপাল বাবু উঠিয়া গেলেন। মনোরমা আসিয়া বৃদ্ধকে ভক্তিভাবে প্রণাম করিয়া জড়সড় হইয়া একটু দূরে গিয়া দাঁড়াইলেন। বৃদ্ধা বলি-লেন—এইটী আপনার শরতের স্ত্রী। বৃদ্ধ ঘোষ মহাশয় এতাবৎ-কাল শরতের উপর এই কারণে কিঞ্চিৎ বিরক্ত ছিলেন এবং নাতিবৌকে দেখিবার জন্য প্রস্তুত হইয়াও আসেন নাই। কিন্তু শরতের স্ত্রীকে দেখিয়া—তাহার সৌন্দর্য্য, তাহার লাবণ্য, তাহার মুখের মিষ্টভাব, তাহার নানাপ্রকার সুলক্ষণ দেখিয়া অতীব প্রীতি

লাভ করিয়া বলিলেন—এমন সুলক্ষণাক্রান্তা মেয়ে আমিত আর কখনও দেখি নাই, এ যে বেশ মেয়ে গা ! এই কথা বলিতে না বলিতে মনোরমা লজ্জায় মাথা হেঁট করিয়া ও অবগুণ্ঠন টানিয়া দিয়া তথা হইতে প্রস্থান করিলেন। দাদা শ্বশুর হাতে কি দিয়াছেন কেহ দেখিল না, মনোরমাও পলায়নের ব্যস্ততার ভিতরে, যাহা হাতে ছিল তাহা ভাল করিয়া না দেখিয়া অঞ্চলে বাঁধিয়া রাখিলেন। বৃদ্ধ শরতের শ্বাশুড়ীর সহিত দুচারিটী কথা কহিতেছেন, এমন সময়ে শরৎ ও রামগোপাল বাবু দুজনেই সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। অন্যান্য কথাবার্ত্তার পর বৃদ্ধ শরৎকে বলি-লেন—তোর কি এখানে স্থান সঙ্কুলন হয় ? এত কষ্ট ক'রে ছোট একটী বাড়ীতে দুজনে থাকিবার দরকার কি ? কাশীপুরের অত বড় কম্পাউণ্ড সুদ্ধ অত বড় বাড়ীটা অমনি পড়ে আছে, এখন সেখানে আর কেহ থাকেনা, তুই সেই বাড়ীটাতে গিয়া থাক্। যদি যাতায়াতের অসুবিধা হয়, তবে আমার গাড়ীখানা আছে, একটী ভাল ঘোড়া কিনিলেই হবে, তুই সেই বাড়ীতে গিয়া বাস কর। শরৎচন্দ্র বলিলেন—দাদাকে বউকে ছেড়ে আমি সেখানে গিয়া থাকিতে পারিব না। অসুবিধার সময়ে, বিপদের সময়ে, এঁরাই আমার পরম সহায় হইয়াছেন, আজ সম্পদ ও সুবিধার জন্য তাঁহাদিগকে ছাড়িতে পারিব না। তবে দাদাও যদি সেখানে গিয়া আমাদের সঙ্গে বাস করেন, তাহা হইলে যাইতে সম্মত আছি। ঘোষ মহাশয় অনেক পীড়াপীড়ি করিয়া রামগোপাল বাবুকেও কাশীপুরের বাড়ীতে যাইতে ও তথায় শরতের সঙ্গে একত্রে বাস করিতে সম্মত করিলেন। সেই পুষ্করিণী ও বাগানসহ বৃহৎ বাটীখানি শরতের নামে লিখিয়া দিলেন। পাঁচসহস্র টাকার কোম্পানির কাগজ বধূর নামে ক্রয় করিয়া দিলেন এবং এক প্রস্থ পোষাকি আর এক প্রস্থ সর্ব্বদা

ব্যবহারের জন্য অলঙ্কার প্রস্তুত করাইয়া দিলেন। শরৎচন্দ্র এই সকল সুখসম্ভোগের সুবিধাকে পরমেশ্বরের কৃপা মনে করিয়া তাঁহাকে প্রতিদিন ধন্যবাদ দিতে লাগিলেন। লক্ষচ্যুত হইয়া যাহাতে সংসারে পথ হারাইয়া না ফেলেন, সেদিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিয়া জীবনের পথে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। যখন তাঁহারা ঘোষ মহাশয়ের কাশীপুরের সেই সুপ্রশস্ত বাসভবনের পশ্চাদ্দিকের পুষ্পোদ্যানে—সেই মনোহর শোভা ও সৌরভপূর্ণ স্থানে মিলিত হইয়া আনন্দ সম্ভোগ করিতে ছিলেন, তখনই আমাদের সহিত শরৎ ও মনোরমার আবার অনেক দিন পরে সাক্ষাৎ হইয়াছে। আমরা দেখিলাম তাঁহারা সংসারে সুখী হইয়াছেন, বসন্তকুমারে তাঁহাদের সুখ ঘনতর হইয়াছে, তাঁহাদের মিলিত জীবন-প্রবাহে নিরন্তর সুখের ঊর্দ্মিমালা সমুৎপন্ন হইতেছে, দেখিলাম বিধাতার কৃপাকণা সকল নিশার শিশিরসম নিপতিত হইয়া অতি সংগোপনে তাঁহাদের জীবনাভিনয়ের শোভা ও মাধুর্য্য বৃদ্ধি করিতেছে, এখন দেখা যাক তাঁহারা বিধাতার আশীর্ব্বাদ ভাজন হইয়া, তাঁহার কৃপা লাভ করিয়া সংসারে কাহার সেবা করিতেছেন—এখন দেখা যাক, তাঁহারা ভগবানের খাইয়া তাঁহারই সেবা করিতেছেন, কি সয়তানের সেবা করিতেছেন। এখন দেখা যাক শরৎচন্দ্রের বিবাহে যে সকল শুভ কল্পনা তাঁহাদের মনে স্থান পাইয়াছিল, যে সকল সাধু সঙ্কল্প সম্মুখে রাখিয়া তাঁহারা এই পরিণয়পাশে আবদ্ধ হইয়াছিলেন, তাহা কিছু পরিমাণেও সুসিদ্ধ হইয়াছে কি না—সে সকল আশার পল্লব মুকুলিত হইয়াছে কি না—সে সকল সঙ্কল্পের অঙ্কুর মস্তক উত্তোলন করিয়াছে কি না—সে সকল কল্পনা-কুসুমনিচয় সাধুচেষ্টার স্নিগ্ধ শিশিরে প্রস্ফুটিত হইয়াছে কি না।
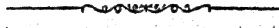
চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

গৃহ কর্ম্মে।

মনোরমা অতি প্রত্যুষে গাত্রোত্থান করিয়া প্রাতঃকৃত্য সমাপনান্তে নিজের সন্তানটীকে উঠাইয়া দেন। বাড়ীতে অন্য যাঁহারা থাকেন, মনোরমার জন্য সকলকেই প্রাতে উঠিতে হয়, কেহই অলস হইয়া শয্যাতে পড়িয়া এপাশ ওপাশ করিতে পারেন না, সংসারের কাজ কর্ম্ম বিশিষ্টরূপে আরম্ভ হইবার পূর্ব্বেই শরৎ নানা স্থান ভ্রমণ করিয়া এবং অনেক দুঃখী দরিদ্র লোকের সংবাদ লইয়া গৃহে আসিয়া উপস্থিত হন। গৃহে আসিয়া সর্ব্বাগ্রে উপস্থিত দুঃখী লোকদের পীড়ার অবস্থা শ্রবণ করেন ও তাহাদের প্রত্যেককে ঔষধ দিয়া থাকেন। এই কাজটিকে তিনি নিত্যব্রত রূপে গ্রহণ করিয়াছেন। এই সকল দরিদ্র লোকদের রোগ যন্ত্রণাতে সাহায্য করিতে পারিবেন এই আশায় নিজে কিছু ক্লেশ স্বীকার করিয়া হোমিপ্যাথি শিক্ষা করিয়াছেন, প্রতিদিন নিজ গৃহে উপস্থিত রোগীদিগকে বিনাব্যয়ে ঔষধাদি দিয়া থাকেন। এই কার্য্যে কিছু সময় ব্যয় করিয়া তৎপরে একবার কাহারও পড়াশুনা জানিয়া লইবার আছে কি না, সে সংবাদ লন। যাহার যাহা বলিয়া দিবার থাকে তাহাকে তাহা বুঝাইয়া দেন। তাহার পর প্রতিদিন প্রাতে যে সংবাদপত্র আসিয়া থাকে, তাহা একবার দেখিয়া থাকেন। কোথায় কোন সভা আছে কি না, সেদিন কোন সদনুষ্ঠানের সূত্রপাত হইবে কি না, কে কোথায় বিপদে পড়িয়াছে, এইরূপ সাধারণ ও অবশ্য জ্ঞাতব্য . বিষয়গুলি সংগ্রহ করেন, তাহার মধ্যে যেখানে যাইবার ইচ্ছা হয়, সেগুলি তৎক্ষণাৎ স্থির করিয়া ফেলেন। তাহার পর স্নান করিয়া কিছু-

ক্ষণ ভগবচ্চিন্তাতে, তাঁহার পূজা অর্চ্চনাতে ক্ষেপণ করিয়া আহারাদি করেন। আহারান্তে দুচারিটী কথা কহিতে কহিতে একটু বিশ্রাম করিয়া কর্ম্মস্থানে যাত্রা করেন। মনোরমা প্রাতে মায়ের উপদেশমতে রন্ধনাদির বন্দোবস্ত করিয়া দেন। শরৎচন্দ্রের দূর সম্পর্কীয়া এক বিধবা মাসী সংসারে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন, তিনি এবং মনোরমার মা মিলিত হইয়া সংসারের অধিকাংশ কাজ সম্পন্ন করেন, মনোরমা ইহাতে অনেক সময় বিরক্ত হন, তথাপি তাঁহারা মনোরমাকে অত্যধিক শ্রমকর কার্য্য করিতে দেন না, কিন্তু মনোরমার কার্য্যের অভাব নাই। নিজ তনয়ের নানাপ্রকার চঞ্চলতা ও দৌরাত্ম্যের ভিতর যাহাতে সদ্ভাব ও সৎ-শিক্ষা স্থান পায় প্রতিনিয়ত সেদিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিয়াছেন। এই একটী কাজ আছে, যাহাতে গৃহের প্রত্যেকে নিযুক্ত হইলেও যথেষ্ট হয় না। শিশুর প্রতি মুহূর্ত্তের নূতন নূতন প্রশ্ন সকলের উত্তর দেওয়া এবং তাহার ক্ষুদ্র জীবনের সকলপ্রকার আবদার শান্তভাবে সহ্য করিবার শক্তি অতি অল্প লোকেরই আছে। এবিষয়ে মনোরমাও আদর্শস্থল হইতে পারেন নাই, মনোরমারও ধৈর্য্যচ্যুতি হয়। তিনি সময়ে সময়ে কর্ত্তব্য বিস্মৃত হইয়া যান—চিত্ত চঞ্চল হইয়া পড়ে—হৃদয় অবসন্ন হইয়া আসে, কিন্তু সে সময়েও তিনি অতি শান্তভাবে নিজের কর্ত্তব্য স্থির করিয়া তাহা-রই অনুসরণ করিতে প্রয়াস পান। তিনি প্রাতের অধিকাংশ সময় সকলের আহারাদির আয়োজনে ব্যস্ত থাকেন, এবং প্রতি দিনের প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি ক্রয় করিয়া আনিলে তাহা নিজে দেখিয়া শুনিয়া বুঝিয়া পড়িয়া লইয়া থাকেন, এ সকল কাজ অন্যের উপর, বিশেষতঃ দাস দাসীর উপর ফেলিয়া রাখা তাঁহার অভ্যাস নহে। দাস দাসী মহলে আর সকল বিষয়ে তাঁহার সুনাম আছে, কেবল এই বিষয়ে তাঁহার বড়ই দুর্নাম, কারণ তাহারা

তাঁহার চক্ষে ধূলি দিয়া দুপয়সা আত্মসাৎ করিতে পারে না। এইটীই তাহাদের প্রধান রাগ। এই সকল কাজ শেষ করিয়া তিনিও স্নানান্তে নির্জ্জনে কিছুকাল তাঁহার ইষ্টদেবতার পূজাদিতে ক্ষেপণ করিয়া থাকেন। কিন্তু স্বামীর আহারের সময় তিনি সর্ব্ব কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া তাঁহার নিকটে বসিয়া থাকেন এবং যাহাতে তাঁহার আহারের কোন ব্যাঘাত না হয়, সে দিকে দৃষ্টি রাখেন। অনেক সময় বিশেষতঃ রাত্রে রামগোপাল বাবু, শরৎচন্দ্র এবং অন্য কেহ কেহ যখন একত্রে আহার করিতে বসিয়া থাকেন, তখন মাকে কিম্বা খোকার মাকে আহারের নিকটে রাখিয়া নিজে একটু দূর হইতে সকল বন্দোবস্ত করিয়া দেন। এমন ভাবে আহারের সুব্যবস্থা করেন যে, আহারের সময় বেশ বুঝিতে পারা যায়, আহারের আয়োজনের অন্তরালে থাকিয়া যেন একজন প্রীতির চক্ষে ও যত্ন সহকারে সমস্ত পর্য্যবেক্ষণ করিতেছেন। এই-রূপ আহারেই লোক তৃপ্তি অনুভব করিয়া থাকে। মনোরমা যে কেবল ভাণ্ডার হইতে দ্রব্যাদি বাহির করেন ও আহারের সুব্যবস্থা করিয়া নিশ্চিন্ত থাকেন, তাহা নহে। সংসারের সমস্ত কার্য্যই নিজে দেখিয়া থাকেন। যত ক্ষুদ্র হউকনা কেন, কোন কার্য্যই তিনি দাস দাসীর উপর ভার দিয়া নিশ্চিন্ত থাকেন না। এসকল বিষয়ে পূর্ব্বে তাঁহার এরূপ অভ্যাস ছিল না। ছোট বড় সকল কাজে সমান অনুরাগ দেখাইবার শক্তি তাঁহার ছিল না। সংসারে সচরাচর এইরূপ ঘটিয়া থাকে যে, যে ব্যক্তি সামান্য পরিবারে জন্মগ্রহণ করিয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয় লইয়া জীবনের শৈশব ও বাল্যকাল কাটা-ইয়া থাকে, উত্তর কালে তাহারা অপেক্ষাকৃত ভাল অবস্থায় পড়িলে—সৌভাগ্যের পথে পদার্পণ করিলে, দিশাহারা হয়, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কর্ত্তব্যগুলিকে আর কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করে না। সে সকল কাজ উপেক্ষার বিষয় হয়—দাস দাসীর উপর সে সকল কার্য্যের

ভার দিয়া নিশ্চিন্ত থাকাই পরম সুখ বলিয়া বোধ হয়, সে সকল কাজের ভার যাহাদের উপর ন্যস্ত থাকে, তাহারা তাহা সম্পন্ন করিল কি না, তাহা জানিবার আবশ্যকতা বোধ পর্য্যন্ত লোপ পায়। কিন্তু মনোরমা সংসারে সুখের ক্রোড়ে উপবেশন করিবার সময়ে, প্রেম এবং প্রীতির আদান প্রদানে জীবনের কোমল ও সরস ভাব সকলের পূর্ণতা সাধনে অগ্রসর হইবার সময়ে, যাঁহার করে আত্ম সমর্পণ করিয়াছিলেন, যাঁহার ভাগ্যস্রোতে আপনার জীবনের স্বপ্নময়ী ক্ষুদ্র আশা-তরণীখানি ভাসাইয়া দিয়াছিলেন, যিনি বিধাতার কৃপা স্মরণ করিয়া এই ক্ষুদ্র তরণীকে সুপথে চালাইয়া, ভয়-বিপদ-সঙ্কুল সংসার সাগরে, শতপ্রকার বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া নিরাপদে অপর পারে লইবার ভার লইয়াছিলেন, তিনি সামান্য লোক নহেন। যাঁহার ধর্ম্মভাব ও সততার নিকট সকল বাধা কাটিয়া গিয়াছে—যাঁহার নিষ্ঠা ও বিনয়ের নিকট সকলেই নত মস্তক হইয়াছে—অথচ তীক্ষ্ণ দৃষ্টি সহকারে সকল বস্তুর মর্ম্ম গ্রহণে ও নিজের কর্ত্তব্যবুদ্ধির অনুমোদিত পথে দৃঢ় প্রতিজ্ঞা সহকারে অগ্রসর হইতে যিনি সর্ব্বদা ব্যস্ত, এমন কর্ত্তব্যপরায়ণ অথচ কোমল প্রকৃতি সম্পন্ন লোকের উপর বিধাতা কৃপা করিয়া তাঁহার জীবনের সদ্গতি ও কল্যাণের ভার দিয়াছেন বলিয়াই মনোরমা দিন দিন জ্ঞানের পথে—উন্নতির পথে—সৌভাগ্যের পথে—অগ্রসর হইতেছেন—তিনি নিষ্ঠাবতী ও কর্ত্তব্যপরায়ণা হইয়া উঠিতেছেন। সংসারের বৃহৎ ব্যাপার সকলে তাঁহার যেমন দৃষ্টি, সামান্য সামান্য বিষয় সকলেও ঠিক সেইরূপ মনোযোগ। দশ জন বন্ধুকে বা আত্মীয় স্বজনকে নিমন্ত্রণ করিলে, তাঁহাদের আহারাদির সুব্যবস্থা করিতে এবং নিমন্ত্রিতগণের আহারে পরিতৃপ্তি বিষয়ে, তিনি যেমন মনোযোগী, একজন পীড়িত, ক্ষুধার্ত্ত বা দরিদ্র ব্যক্তি দ্বারে ভিক্ষাপ্রার্থী হইলে

তাহাকেও সন্তুষ্ট করিতে তিনি তদনুরূপ যত্নশীলা। বহু মূল্য পরিচ্ছদাদি তাঁহার নিকট যেমন যত্নের বস্তু—প্রতিদিন যেসকল বস্ত্র সকলে পরিধান করিয়া থাকেন, তাহার প্রত্যেক খানির প্রতিও সেইরূপ দৃষ্টি থাকে। কোন খানি একটু ছিঁড়িয়াছে, অমনি তাহাকে মেরামৎ করিলেন—কোন মোজাটী, একটু কাটিয়াছে, অমনি সেটীকে রিপু করিলেন—ইহাতে এই উপকার হয়, অল্প আয়ে অল্প ব্যয়ে সংসারের অনেক অভাব পূরণ হয়। অধিকাংশ সময়ে শরৎচন্দ্র আফিসে গেলে মনোরমা নিজ তনয়কে ও অবিনাশকে (রামগোপাল বাবুর খোকা) লইয়া বসেন, তাহাদিগকে লিখিতে বা অঙ্ক কসিতে দেন এবং নিজে নিকটে বসিয়া হয় কোন একটী নূতন কাপড় সেলাই করেন, না হয়, যেসকল কাপড় ধোপার বাড়ী যাইবে, তাহার কোনটীতে বোতাম লাগাইয়া দেন, নাহয় সেলাই করেন। অনেক সময় হাত দুখানি সংসারের কাজে ব্যস্ত থাকে, অথচ তিনি হয়ত তাঁহার গৃহের বালকগণের সহিত মিলিত হইয়া নানা প্রকার কৌতূহল উদ্দীপক নীতি ও ধর্ম্ম বিষয়ক গল্পের দ্বারা তাহাদের চিত্তরঞ্জনে নিযুক্ত থাকেন, অথবা নিজে নিজের মধ্যে মগ্ন হইয়া সংসারের অতীত বিষয় সকলের ধ্যানে মগ্ন হইয়া থাকেন; বালকেরা নিকটে বসিয়া লেখা পড়া করে। সংসার-সুখের মোহন বীণা নিরন্তর যাহাদের কর্ণে ধ্বনিত হয়, তাহাদের করিবার আর কিছুই থাকে না; অবশ ও অলস হইয়া তাহারা সুখের ক্রোড়ে শয়ন করিয়া নিরন্তর বিশ্রাম সুখ সম্ভোগ করিতে ব্যস্ত—আলস্য ইহাদের পরম বন্ধু এবং এই বন্ধুতা-সূত্রে কুভাব, কুচিন্তা, পরের অনিষ্ট কল্পনা ও অসদালাপ প্রভৃতি অনুচরবর্গ আসিয়া লোকের আশ্রয় গ্রহণ করে; এবং অসার সুখ-লালসাপূর্ণ জীবনকে অতীব বিষাদময় করিয়া তুলে। মনোরমা প্রেমমালার দেবী-মূর্ত্তি দেখিয়াছেন, পুণ্যশ্লোকসদৃশ

তাঁহার সেই কার্য্যকলাপের কথা শুনিয়াছেন। সে স্ত্রীলোক হউক, আর পুরুষ হউক, কি উপায়ে এই রক্তমাংসময় দেহ ধারণ করিয়া প্রতি মুহূর্ত্তে স্বর্গসুখ ভোগ করিতে পারে, কর্ম্মময় জীবনে চন্দনের স্নিগ্ধ সৌরভ, গোলাপের মনোহর কান্তি এবং পারিজাতের চিত্তমুগ্ধকারী শোভা ও সুবাস সম্ভোগ করিতে পারে, মনোরমা প্রেমমালার দেবভাবময় জীবনের পবিত্র কার্য্য কলাপের মধ্যে তাহা দেখিতে পাইয়াছেন এবং তাঁহার প্রিয়তম স্বামীর সুপরামর্শে চলিয়া নূতন ভাবে গঠিত হইয়া উঠিতেছেন। তাঁহার যে সকল সদ্ব্যবহার স্মরণ করিয়া—তাঁহার যে সকল সদাচার সন্দর্শন করিয়া—তাঁহার যে সেবার ভাবে আপ্যায়িত হইয়া ও মিষ্ট কথা শুনিয়া শরৎচন্দ্র ও তাঁহার অন্যান্য আত্মীয়গণ দিন দিন অধিকতর মুগ্ধ হইতেছেন, মনোরমার সে সকল সদ্গুণ অর্জ্জনে শরৎচন্দ্রই তাঁহার প্রধান গুরু। এই জন্যই সে দিন মনোরমা শরতের বন্ধুতা, সখিত্ব, প্রেম ও প্রিয়জনের ভাব বিস্মৃত হইয়া আপনার ক্ষুদ্রত্ব ও শরতের মহত্ত্ব স্মরণ করিয়া তাঁহার চরণ স্পর্শ করিয়া আপনাকে কতবার ধন্য মনে করিতে লাগিলেন। শরৎ প্রিয় সম্ভাষণ ও প্রেমালিঙ্গন দ্বারা মনোরমাকে চরণস্পর্শ সুখভোগ হইতে বিরত করিতে পারিলেন না, তাই মনোরমা বলিয়াছিলেন ঃ—

"বিধাতা তোমাকে দিয়া আমাকে এত সুখী করিবেন, আমিত স্বপ্নেও জানিতাম না। আমি দুঃখিনী, আমার ভাগ্যে এত সুখ কেন? আর তুমি আমাকে জ্ঞান ও ধর্ম্মে তোমার উপযুক্ত করিয়া তোমার ভালবাসা প্রেম ও মহত্ত্বের পরিচয় দিয়াছ; আমি তোমার চরণ স্পর্শ করিতেছি, ইহাতে যে আমার কত সুখ ও আনন্দ হইতেছে, তাহা কি তুমি বুঝ না?"

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

সন্তান পালনে।

সংসারের সমস্ত কাজের উপর পূর্ণ দৃষ্টি রাখিতে হইলেও, মনোরমা সন্তানদের প্রতি বিশেষ ভাবে দৃষ্টি রাখিয়া থাকেন। শরৎচন্দ্র মনোরমার যতপ্রকার উন্নতি সাধনে সাহায্য করিয়াছেন, তাহার মধ্যে ইহাই সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ। দুইটী কারণে মনোরমার সন্তান পালন অপেক্ষাকৃত একটু কঠিন কার্য্য হইয়া পড়িয়াছে। মনোরমার মা সকল বিষয়েই মনোরমার কাজ কর্ম্ম পছন্দ করেন, মনোরমা তাঁহার জননীর জীবন সর্ব্বস্ব, মনোরমা ভিন্ন তিনি আর কিছুই জানেন না, মনোরমার সুখচিন্তা তাঁহার সমগ্র জীবনকে অধিকার করিলেও বসন্তকুমার তাঁহার হৃদয়-পুতলি—নয়ন-তারা হইয়াছে, একথা বলা বাহুল্য মাত্র। বিচারবুদ্ধিশূন্য হইয়া বৃদ্ধা সেই বালকের প্রতি আসক্ত হইয়া পড়িয়াছেন, তাহার কোন প্রকার ত্রুটিকে ত্রুটি বলিয়া মনে করেন না, সে বালক তাঁহার নিকট আপনাকে সম্পূর্ণরূপে অজেয় বলিয়া মনে করিতে আরম্ভ করিয়াছে। বাল্য-চপলতা যদি আপনাকে পূর্ণরূপে স্বাধীন ভাবিবার একটী স্থানও পায়, তাহা হইলে তাহার সর্ব্বনাশের যে কি প্রশস্ত পথ প্রস্তুত হইতে থাকে, তাহার কল্পনাতেও প্রাণে গভীর ক্ষোভের সঞ্চার হয়। দিদিমায়ের অস্বাভাবিক স্নেহ মমতার আশ্রয়ে বসন্ত কুমার অসঙ্গত আব্‌দারে, অন্যায় অধিকার ও অত্যাচারপ্রিয় হইয়া উঠিতেছে দেখিয়া মনোরমা বড় চিন্তাকুল হইয়া পড়ি-লেন। তিনি তাঁহার মাকে কোন প্রকারে বুঝাইতে গেলে, কিম্বা কোন প্রকার পরামর্শ দিতে গেলে, তিনি অত্যন্ত বিরক্ত

ও অসন্তুষ্ট হন। সন্তানকে সুপথে পরিচালিত করিবার সদুপায় সকল ব্যর্থ হইয়া যাইতেছে দেখিয়া, তাঁহারা স্বামী স্ত্রী দিন দিন অত্যন্ত চিন্তিত হইয়া উঠিতেছেন। বালকের সুশিক্ষা লাভে এই যে কঠিন অন্তরায় উপস্থিত হইয়াছে, রামগোপাল বাবুর ছেলে অবিনাশ একত্রে থাকায়, তাহা আরও গুরুতর আকার ধারণ করিয়াছে। বসন্তকুমারের প্রতি তাহার দিদিমায়ের স্নেহাধিক্য নিবন্ধন বালকদ্বয়ের কলহ ও দ্বন্দ্বে সুবিবেচনা সহকারে তাহা-দিগকে শাসন করিতে, প্রয়োজন হইলে, দণ্ড দিতে চেষ্টা করা কি কঠিন কার্য্য হইয়া পড়িয়াছে, তাহা তাঁহারাই কেবল সম্যক অনুভব করিতে পারিবেন, যাঁহারা এরূপ সমস্যার মধ্যে কখন পড়িয়াছেন। মনোরমার সন্তানপালন এই দ্বিবিধ কারণে অত্যন্ত গুরুতর হইয়া পড়িয়াছে। অনেক সময়ে মনোরমা কর্ত্তব্য স্থির করিতে না পারিয়া চারিদিক অন্ধকার দেখেন, অনেক সময়ে তাঁহার মনে হয়, একার্য্য বোধ হয় তাঁহার দ্বারা সুন্দররূপে সম্পন্ন হইবে না। শরৎচন্দ্র অনেক সময়ে গৃহে আসিয়া দেখেন এই কারণে তাঁহার জীবনতোষিণীর সুমিষ্ট মুখখানি ম্লান হইয়া রহি-য়াছে, কিন্তু শরতের উৎসাহ বাক্যে ও সদুপদেশে তাঁহার প্রাণের অবসাদ হরণ করে—তিনি আবার নূতন উৎসাহ ও উদ্যমের সহিত সংসারের কার্য্যে নিযুক্ত হন।

রামগোপাল বাবু ও খোকার মা মনোরমার সন্তান পালনের রীতি নীতি সম্পূর্ণরূপে অবগত আছেন বলিয়া এবং তাঁহার ন্যায়-বিচার ও নিষ্ঠার প্রতি পূর্ণ বিশ্বাস আছে বলিয়া, কখন কোন প্রকার মনোমালিন্য ঘটে না। তাঁহারা তাঁহাদের বালকের সুশি-ক্ষার ভার মনোরমা ও শরতের উপর দিয়া কথঞ্চিৎ সন্তুষ্ট আছেন, কারণ তাঁহারা জানেন যে তাঁহাদের ছেলের সুশিক্ষা, সদ্ভাব ও সৎস্বভাবের উপর, বসন্তকুমারের সুশিক্ষা নির্ভর করিতেছে,

এজন্য মনোরমা উভয়ের শিক্ষালাভে সমানভাবে যত্ন করিবেন। কিন্তু তাঁহারা অনেক সময়ে মনোরমার মায়ের স্বার্থান্ধভাব দেখিয়া অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হইতেন, অনেক সময়ে কর্ত্তব্য অবধারণে অসমর্থ হইয়া নীরবে সে অন্যায় ব্যবহার সহ্য করিতেন, নিতান্ত প্রয়োজন হইলে গোপনে মনোরমাকে সমস্ত বলিয়া কোন সদুপায় অবলম্বন করিতে অনুরোধ করিতেন। জননীর বিরুদ্ধে এই অনুযোগ ক্লেশদায়ক হইলেও মনোরমা নতমস্তকে তাহা সহ্য করিতেন। তিনি জননীর এই সঙ্কীর্ণতা দূর করিবার নানাপ্রকার উপায় চিন্তা করিতে লাগিলেন। জননীর সহিত সন্তানদের সম্বন্ধে কোনপ্রকার পরামর্শ করিতে গেলে, তিনি মনোরমার অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া অত্যন্ত বিরক্তি প্রকাশ করিতেন। এক্ষণে এমন হইয়াছে যে এই বিষয়ে মায়ের সম্বন্ধে একপ্রকার নিরাশ হইয়াছেন। তাঁহার দ্বারা সন্তানের যে ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা, তাহা আর সংশোধন হইবে না। সেই টুকু বাদ রাখিয়া যতদূর সম্ভব সুশিক্ষা দানের পন্থা অবলম্বন পূর্ব্বক চলিতে লাগিলেন, কিন্তু তাও কি কখন সম্ভব হয়? গৃহের এক দিক সম্পূর্ণ অরক্ষিত রাখিয়া ধনসম্পত্তিসহ আপনাদিগকে নিরাপদ মনে করা যেমন অসম্ভব, শিশুর জীবনে সদাচার, সদ্ভাব ও সন্নীতি স্থান পাইবার পক্ষে গুরুজনের অসদ্দৃষ্টান্ত তদপেক্ষা কোটী গুণে যে সাংঘাতিক তাহাতে অনুমাত্রও সন্দেহ নাই। শেষে মনোরমা ও শরৎচন্দ্র দেখিলেন যে বৃদ্ধার সম্বন্ধে উদাসীন হওয়া আর সন্তানের সর্ব্বনাশ করা একই কথা। এক্ষণে উপায় কি? এই গুরুতর চিন্তা তাঁহাদের দুজনকে আকুল করিয়া তুলিল। শেষে বহু চিন্তার পর দ্বিবিধ উপায় অবলম্বন করিলেন। প্রথম উপায় এই যে বালকদিগকে অনেক সময় দিদিমায়ের নিকট হইতে দূরে দূরে রাখিতে এবং নানা স্থানে লইয়া গিয়া, নানাপ্রকার ঘটনার ভিতর দিয়া তাহাদের

াণে সরলতা, শিষ্টাচার, বিনয় ও অমায়িকতা প্রভৃতি সদ্গুণ
কল বহুল পরিমাণে মুদ্রিত করিবার পন্থা উদ্ভাবন করিতে
লাগিলেন। শিবপুর কোম্পানির বাগানে ও কলিকাতায় ইডেন
গার্ডেনে ও অন্যান্য উদ্যানে বালক বালিকাদিগকে লইয়া গিয়া
নানাবর্ণের পত্র, পুষ্প ও ফলের শোভা দেখাইয়া তাহাদের চিত্তবৃত্তি
সকলের স্ফূর্ত্তি বর্দ্ধন করিতে লাগিলেন। মধ্যে মধ্যে আলিপুর
পশুশালায় তাহাদিগকে লইয়া গিয়া দুর্দ্দান্ত ব্যাঘ্র ভল্লুক প্রভৃতি
পশুগণের স্বভাব প্রকৃতি, পক্ষীদিগের প্রফুল্লভাব, কাকাতুয়ার ক্রীড়া
কৌতুক—নন্দন-পক্ষীর (Bird of Paradise) অনুপম শোভা, হস্তি-
শাবকের আহার বিহার, বানরদিগের মহা কোলাহল, ময়ূরের পুচ্ছ
বিস্তার ও নৃত্য প্রভৃতি প্রাণী রাজ্যের নানা তত্ত্ব ও নানা ভাব
শিখাইতে লাগিলেন। কয়েকবার চিত্রশালায় (যাদুঘর) লইয়া গিয়া
এক দিকে পৃথিবীর অবস্থাবিষয়ক পুরাতন প্রমাণপ্রদ নানাপ্রকার
বস্তু দেখাইয়া বুঝাইয়া দিতে লাগিলেন যে, পৃথিবী সহসা এমন
সুন্দর আকার ধারণ করে নাই। বহুকাল ধরিয়া ইহার গঠন
কার্য্য চলিয়াছে এবং ক্রমে ক্রমে পৃথিবী এমন সুন্দর শ্রী ধারণ
করিয়াছে। সেখানে নরকঙ্কাল, শিশুকঙ্কাল, ও অন্যান্য জীব-
কঙ্কাল দেখিয়া বালকেরা যখন অবাক্ হইয়া গেল, তখন শরৎচন্দ্র
বেশ সুন্দররূপে বুঝাইয়া দিলেন যে তাহাদের ক্ষুদ্র দেহও ঐরূপ
ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কঙ্কালের সমষ্টি মাত্র। তাহাদের দেহের কোন্ স্থানে
কোন্ অস্থিখানি স্থাপিত তাহাও দেখাইয়া দিলেন। তিমির
চোয়ালের যে বড় বড় হাড় রহিয়াছে—কত বড় জন্তু হইলে তাহার
চোয়ালের হাড় অতবড় হইতে পারে, তাহাও বুঝাইয়া দিলেন।
এরূপ জীব যে পল্বল, পুষ্করিণী, খাল, বিল বা নদীর ন্যায় ক্ষুদ্র জলা-
শয়ে বাস করিত পারে না—তাহাও বুঝাইয়া দিলেন। সমুদ্র যে
কত বড় ও কত গভীর, তাহাও বুঝাইয়া দিবার অবসর ছাড়িলেন

না। সমুদ্রে তিমি ভিন্ন আরও কত জলজন্তু ও বৃহৎ বৃহৎ মৎস
বাস করে,তাহাও বুঝাইয়া দিতে ভুলিলেন না। নানা বর্ণের
পতি,মৎস্য,সরীসৃপ ও অন্যান্য জীবদেহ সন্তর্পণে সুরক্ষিত হই
তাহা দেখাইয়া তাহাদের বিষয় কিছু কিছু বলিলেন। নানা দে
মনুষ্য মূর্ত্তি সকল দেখাইয়া তাহাদের বিষয়েও কিছু কিছু বুঝাই
দিলেন। বসন্তকুমার ও অন্যান্য বালকেরা পিতামাতা ও অন্যান
আত্মীয় স্বজনের সঙ্গে এইরূপে নানা স্থানে গমন পূর্ব্বক নানা তত্ত্ব
অবগত হইতে ও নানা প্রকার শিক্ষা লাভ করিতে লাগিল। সঙ্গে সঙ্গে
পরস্পরের প্রতি ভালবাসা ও বন্ধুতার ভাব বৃদ্ধি হইতে লাগিল
মনোরমার মা বসন্তকুমারের প্রতি অত্যন্ত আসক্ত হইলেও, তাহার
জ্ঞানোন্নতি ও আদর বৃদ্ধিতে সন্তুষ্ট হইয়া ক্রমশঃ বাটীর অন্যান্য
বালক বালিকাদিগকেও স্নেহের চক্ষে দেখিতে লাগিলেন। বাড়ীতে
যে কয়েকটী ছেলে মেয়ে আছে, এইরূপ উপায় দ্বারা তাহারা ক্রমশঃ
আত্মপরভাব ভুলিয়া যাহাতে একজন আর একজনকে একবারে
আপনার মত ভাল বাসিতে শিক্ষা করে, তাহারই চেষ্টা করিতে
লাগিলেন। এইটী হইল সাক্ষাৎ প্রতিবিধান। অপর একটী পরোক্ষ
উপায় অবলম্বন করিলেন, সেটী এই যে নানাপ্রকার পুস্তক ও
সংবাদপত্র হইতে এমন সকল গল্প আরম্ভ করিলেন, যাহাতে
বালকেরা সদুপদেশ লাভ করে, অথচ সঙ্গে সঙ্গে দিদিমায়ের
কর্ত্তব্যজ্ঞানের উদয় হয়। বৃদ্ধাদের স্নেহাধিক্যে বাল্যজীবন যে
কিরূপ ক্ষতিগ্রস্ত হয়, আর তাঁহারা সাবধানতা অবলম্বন করিলে,
বালক বালিকাদিগকে কিরূপে ন্যায় ও নিষ্ঠার পথে রক্ষা করা
যায়, তাহার উপযোগী গল্প সকল আরম্ভ করিলেন। ক্রমশঃ বসন্তের
উপর হইতে তাঁহার মমতাময় সঙ্কীর্ণতা ও অন্ধ স্নেহপ্রাবল্যের জাল
কাটিয়া গেল। তিনি গৃহের সকল গুলিকেই সমান চক্ষে দেখিতে
লাগিলেন।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

স্বার্থ-ত্যাগে।

সুখ এবং সম্পদের ভিতর দিয়া শরৎচন্দ্রের দিনগুলি এক্‌ এক করিয়া কাটিয়া যাইতেছে! এমন প্রভাত অনেক হইয়াছে, যাহার স্নিগ্ধ সমীরণের কথাই কেবল স্মরণ আছে, লোহিত বর্ণে রঞ্জিত পূর্ব্বগগনের অনুপম শোভার কথাই কেবল মনে আছে, সেই স্তরে স্তরে বিন্যস্ত শ্বেত কৃষ্ণ মেঘকণা সকলের অগ্নিস্পর্শ ও দহনাভাই কেবল স্মৃতিকে অধিকার করিয়া রাখিয়াছে, সেই নিস্তব্ধ উপবন সমূহের নিদ্রাভঙ্গ, গাত্রোত্থান ও প্রভাত সঙ্গীতের কথাই কেবল স্মরণ আছে, সেই মধুর স্নিগ্ধতাপূর্ণ নির্জ্জন উপবন সকলের নীরব প্রীতির কথাই কেবল মনে আছে, সেই গগনস্পর্শী উচ্চশির সুপ্রবীণ বৃক্ষ সকলের অভিজ্ঞতার সাক্ষ্যদানের কথাই কেবল স্মরণ হয়, আর সেই বিটপীশ্রেণী-পরিশোভিত সুপ্রশস্ত রাজপথ নীরবে অমর-কীর্ত্তি-সম্পন্ন ইংরাজ রাজের রাজ্য স্থাপনের বঃয়ক্রম নির্ণয় করিয়া দিতেছে, ইহাই কেবল স্মরণ হয়। যখন এসকল কথা মনে হয়, তখনই তিনি নূতন কিছু করিবার জন্য ব্যস্ত হন। তাঁহার প্রতিদিনের কার্য্যের তালিকা আমরা দিয়াছি, তাহাতে তাঁহার প্রাণ জুড়ায় না! ব্রহ্মাণ্ডের অধিপতি বিশ্বপাতা করুণা করিয়া মানবের কর্ম্মক্ষেত্র এত বিস্তৃত করিয়া রাখিয়াছেন যে, কয়েকটী কাজ ব্রতরূপে গ্রহণ করিয়া তাহা সুসম্পন্ন করিয়া ভগবানের প্রিয় সন্তান নিরস্ত থাকিতে পারেন না। প্রাণে সদ্ভাব যতই বর্দ্ধিত হইতে থাকে, হৃদয়ে যতই ঈশ্বরপ্রীতির ভাব স্থান পাইতে থাকে, মানুষের হৃদয় মন ততই প্রশস্ত ও কর্ম্মপূর্ণ হইতে থাকে। শরৎ-

চন্দ্রের জন্মস্থান কলিকাতার সন্নিকটে হইলেও সেখানকার অনেকে দরিদ্রতানিবন্ধন উৎকৃষ্টরূপে বিদ্যা শিক্ষা করিতে পারিতেছে না। অনেকে অন্নাভাবে দেহ ধারণ করাই কষ্টকর ভাবিয়া আকুল হইয়া পড়িতেছে। এ সংবাদে শরৎ এবং মনোরমা দারুণ মর্ম্ম-বেদনা পাইয়াছেন। শরৎ পূর্ব্ব হইতে নিজ পল্লীর কয়েকটী অসহায় বালকের বিদ্যাশিক্ষার জন্য অর্থ ব্যয় করিয়া নিকটবর্ত্তী বিদ্যালয়ে পড়িবার সুবিধা করিয়া দিয়াছেন, কিন্তু তাহাতে সেখানকার লোকদের অভাব দূর হইতেছে না এবং তাঁহাদের হৃদয়ের তৃপ্তিও হইতেছে না। এমন কিছু করিবার ইচ্ছা প্রবল হইয়াছে, যাহাতে জন্মস্থানের এবং নিকটবর্ত্তী গ্রাম সমূহের স্থায়ী কল্যাণ সাধিত হয়। এই সময়ে এক দিন সন্ধ্যার প্রাক্কালে শরৎ ও মনোরমা পুষ্পোদ্যানে বসিয়া যে কথা বার্ত্তা কহিতেছিলেন, তাহাতেই তাঁহাদের হৃদয়ের আকাঙ্ক্ষা ও তাহার আবেগ কতকটা বুঝিতে পারা যাইবে।

শ। আমি যে ১০।১২টী ছেলের লেখা পড়া শিক্ষার ব্যয় ভার বহন করিতেছি, ইহাতে আমার প্রাণে তৃপ্তি হয় না।

ম। কেন, অতগুলি গরিবের ছেলে লেখা পড়া শিখিতেছে, এটা কি কম আনন্দের বিষয় ?

শ। আনন্দের বিষয় হইত, যদি ইহারা লেখা পড়া শিখি-তেছে কি না, তাহা আমি নিজে দেখিতে পারিতাম।

ম। কেন বিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষরা উপযুক্ত পাত্রকেই ত তোমার প্রদত্ত বৃত্তি হইতে বেতন দিয়া থাকেন, যাহারা গরিব অথচ উৎকৃষ্ট ছাত্র, তাহাদিগকেইত তাঁহারা তোমার টাকায় পড়িতে দিবেন ?

শ। হাঁ তাই বটে, কিন্তু তুমি ত জান না, সহস্র চেষ্টা করি-লেও পরের হাতে অর্থের সদ্ব্যয় হয় না, আমাদের এক মুষ্টি

চাউল বা একটী পয়সা আমরা যত বিবেচনা করিয়া লোককে দিব, অন্য লোকে কি সেরূপ বিবেচনা করিয়া দিতে পারে? পরের অর্থ ব্যয় করিবার ভার ন্যস্ত থাকিলে, কত সাবধানতার সহিত সে অর্থ ব্যয় করিতে হয়, সে শিক্ষাই এখনও এদেশের লোকের হয় নাই। আমার অর্থ যতদূর ভাবিয়া ব্যয় করি, অন্যের অর্থ তত ভাবিয়া ব্যয় করি কি না, সে বিষয়ে আমার গভীর সন্দেহ আছে। আর করিলেও, সেরূপ লোকের সংখ্যা অতি বিরল।

ম। আমরা ত আর খুব বড়লোক নই, আমাদের অর্থের যতদূর সম্ভব সদ্ব্যয় হয়, তাহার উপায় করা নিতান্ত আবশ্যক, কি করিলে ইহা অপেক্ষাও উৎকৃষ্টরূপে ঐ অর্থ ব্যয় করা হইতে পারে, ভাবিয়া দেখ না?

শ। আজ কয়েক দিন ভাবিয়া একটী উপায় স্থির করিয়াছি, সেরূপ একটী কাজ করিতে অনেক অর্থ ব্যয় হইবে, এইজন্য তোমাকে সে বিষয়ে কিছু বলিতে ভয় হইতেছে। কিন্তু সেরূপ একটী উপায় করিতে পারিলে বড় উপকার হয়। যাহাদের জন্য অর্থ ব্যয় করিব তাহাদের বাস্তবিক কল্যাণ হয় এবং আমাদেরও অর্থ ব্যয় করিয়া প্রাণে আত্মপ্রসাদ লাভ হয়।

ম। কি করিতে চাও, বল না?

শ। গভর্ণমেণ্ট্ স্কুলের প্রাঙ্গণের মধ্যে অনেক জমি পড়িয়া আছে, সেই জমির উপর যদি বালকদের বাসোপযোগী একটী বাড়ী করিয়া দেওয়া যায় এবং সেখানে অর্থ ব্যয় করিয়া গরিব ছেলেদের থাকিবার ব্যবস্থা করিয়া দেওয়া হয়, তাহা হইলে কিয়ৎ পরিমাণে তাহাদের শিক্ষার সুবন্দোবস্ত করা যাইতে পারে।

ম। তাহাতে অনেক অর্থ ব্যয় হইবে। সে কর্ম্ম আমাদের ন্যায় ক্ষুদ্র লোকের সাধ্যায়ত্ত নহে। ছোট ছোট ছেলেদের

খাওয়া দাওয়া ও রক্ষণাবেক্ষণের ভার লইবার উপযুক্ত লোক চাই। তাহাদের চিকিৎসার সুব্যবস্থা হওয়া আবশ্যক। তাহাদের পড়া শুনা যথারীতি পর্য্যবেক্ষণের ভার লইবার লোকের প্রয়োজন।

শ। কার্য্যটী কঠিন বটে, সেরূপ তত্ত্বাবধানের উপযুক্ত লোক সহজে মিলিবে না, তাও সত্য কথা, পরের ছেলের পিতা মাতার স্থান লইতে পারে, এরূপ লোকের সংখ্যাই অতি অল্প ; তবে ওখানে যে হেড্‌মাষ্টার আছেন, তিনি বড় ভাল লোক। তাঁহার সদ্ব্যবহারে ওখানকার সকলেই অত্যন্ত প্রীত এবং বিদ্যালয়ের ছেলেরা তাঁহাকে পিতার ন্যায় ভাল বাসে ও ভক্তি করে। তাঁহার উপর ভার দিলে কাজটী বোধ হয় বেশ চলিতে পারে। আর আমার বোধ হয় হেড্‌মাষ্টার দ্বারা চেষ্টা করিলে সরকারী টাকায় বাড়ীটীও প্রস্তুত হইতে পারে। আমি যদি চেষ্টা করি, তাহা হইলে আমরা কয়েকজনে হাজার কি দুহাজার টাকা দিতে পারি, অবশিষ্ট টাকা দিয়া গভর্ণমেণ্ট বাড়ী প্রস্তুত করাইয়া দিতে পারেন। বাড়ী প্রস্তুত হইলে অনেক মধ্যবিৎ অবস্থার লোক অল্প অর্থ ব্যয়ে আপন আপন সন্তানদিগকে ঐখানে রাখিয়া লেখা পড়া শিখাইতে পারিবেন, আমার শক্তি অনুযায়ী আমিও অর্থ ব্যয় করিয়া চারি পাঁচটী বালকের লেখা পড়ার ভার লইতে পারি।

ম। আচ্ছা, আমরা কত টাকা দিলে, অবশিষ্ট টাকার জন্য অন্য ভদ্রলোকদিগকে তুমি অনুরোধ করিতে পার ?

শ। তুমিই বলনা, আমাদের কতটাকা দিলে ভাল হয় !

ম। আমি কি বলিব। তবে তুমি যাহা দেওয়া উচিত মনে করিবে, তাহাই দিতে প্রস্তুত আছি।

শরৎচন্দ্র বলিলেন—কত দিলে ভাল হয়, ৫০০ টাকা ?

ম। আমি ভাবিয়াছিলাম, যে হাজার টাকা হইলে অবশিষ্ট

টাকা সরকার হইতে পাওয়া যায়, সেই হাজার টাকাই আমরা দিব। হাজার টাকার জন্ম আবার অন্য লোকের নিকট কেন সাহায্য লইবে? আমার যে টাকা আছে, সেই টাকা হইতে ১০০০ টাকা দাও।

শ। আচ্ছা, তবে সেই কথাই ভাল, কিন্তু তোমার টাকা গুলিতে তোমার এখনও সম্পূর্ণ অধিকার জন্মায় নাই। দাদা মহাশয় যত দিন বাঁচিয়া আছেন, তত দিন তুমি ঐ টাকা সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে ব্যয় করিতে পার না এবং পারিলেও করা উচিত নহে।

ম। তবে কি হবে, আমার টাকা দেওয়া হবে না?

শরৎ বলিলেন—এক কাজ কর, তুমি ৫০০ টাকা দাও, আর আমি ৫০০ টাকা দিই। তোমার টাকার যে সুদ জমিয়াছে এবং আমি সময়ে সময়ে তোমাকে যে কিছু কিছু টাকা দিয়াছি—তাহা হইতেই তুমি ৫০০ টাকা দিতে পারিবে—তাহা হইলেই ঠিক হইবে। মনোরমা তাহাতেই সম্মত হইলেন।

শরৎচন্দ্র পর দিন রবিবার নিজ গ্রামের স্কুলের হেড্মাষ্টার মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া এই বিষয়ে পরামর্শ করিতে যাওয়া স্থির করিলেন।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

পরোপকারে।

শরৎচন্দ্র পরদিন নিজ গ্রামে গিয়া বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের সহিত পরামর্শ করিয়া সমস্ত স্থির করিয়াছেন। নিজে স্বাক্ষর করিয়া এক আবেদনপত্র গভর্ণমেণ্টের নিকট প্রেরণ করিলেন এবং নিজে কর্ত্তৃপক্ষদের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া সমস্ত

স্থির করিয়া ফেলিলেন। তাঁহার ও তাঁহার সহধর্ম্মিণীর সাহায্য পাইয়া গভর্ণমেণ্ট অবশিষ্ট ব্যয় ভার বহন করিয়া উক্ত বিদ্যালয়ের প্রাঙ্গণে একটী ক্ষুদ্র অথচ সুন্দর ছাত্রাবাস নির্ম্মাণ করাইয়া দিলেন। শরৎচন্দ্রের হৃদয়ের আনন্দ স্রোতঃ উথলিয়া উঠিল। তিনি এক রবিবারে মনোরমাকে সঙ্গে লইয়া সেই বাটী খানি দেখিয়া আসিলেন। উভয়ে অসীম আনন্দ-সাগরে নিমগ্ন হইলেন। স্বদেশ বিদেশের অনেকগুলি দরিদ্র বালক এই আশ্রমে থাকিয়া প্রতিপালিত ও সুশিক্ষিত হইবে, এই আনন্দে তাঁহারা আজ দিশাহারা হইয়া পড়িলেন। এখানে কলিকাতা অপেক্ষা অনেক অল্প ব্যয়ে ছাত্রদিগের ভরণ পোষণ ও সুশিক্ষা লাভের সুবিধা হইবে এবং তাঁহাদের অর্থ সাহায্যে অনেকগুলি গরিব বালক সংসারে জ্ঞানের পথে অগ্রসর হইবে, উন্নতি করিতে সক্ষম হইবে এই আনন্দ আজ তাঁহাদের চিত্তকে অধীর করিয়াছে। ছাত্রাবাস দর্শনান্তে কাশীপুরের বাটীতে প্রত্যাগমন কালে পথে অনেক পরামর্শ স্থির হইল। আপাতত অন্যূন পাঁচটী বালকের সমস্ত ব্যয়ভার গ্রহণ করা স্থির হইল। এবং এই ভার বহনের জন্য যাহা ব্যয় হইবে, তাহা শরৎচন্দ্রের মাসিক আয় হইতে ব্যয় করা হইবে, তাহাও স্থির হইল, এই ব্যয় সঙ্কুলনের জন্য নিজেরা কিছু সাংসারিক ক্লেশ সহ্য করিতে, কিছু ত্যাগস্বীকার করিতে প্রস্তুত হইলেন। বিধাতার কি আশ্চর্য্য মহিমা, যে ব্যক্তি সদ্ভাবকে, প্রেমকে, লোকের কল্যাণ কামনাকে, একবার প্রাণে স্থান দেয়, তাহার হৃদয়ে আর শান্তি থাকে না। লোকের হিত কামনার চিন্তা মানবহৃদয় অধিকার করিলে, তাহার সংসার সুখ-লালসা, তাহার স্বার্থপরতা, তাহার আত্মসুখেচ্ছার প্রকোপ খর্ব্ব হইতে থাকে। মনোরমা ও শরৎচন্দ্র নিজেদের ব্যয় সঙ্কোচ করিয়া অন্য দশজনের দুঃখ কষ্টের পরিমাণ হ্রাস করিতে বদ্ধপরিকর হইলেন। ছাত্রাবাস সম্পূর্ণরূপে বাসোপযোগী হইলে পর,

গভর্ণমেণ্টের অনুমতি অনুসারে ঐ বৎসর পূজার পর হইতে সেখানে ছাত্রগণকে স্থান দেওয়া আরম্ভ হইল। শরৎচন্দ্রের সাহায্যপ্রাপ্ত বালকগণও অন্যান্য বালকদের ন্যায় বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের তত্ত্বাবধানে বাস করিয়া তাঁহার উপদেশ ও পরামর্শ মতে চলিয়া দিন দিন উন্নতি লাভ করিতে লাগিল দেখিয়া শরৎ ও মনোরমা প্রীতি ও আনন্দ অনুভব করিতে লাগিলেন। শরৎচন্দ্র ছাত্রাবাস পরিদর্শন ও তত্ত্বাবধানের ভার প্রাপ্তগণের মধ্যে একজন; অনেক সময় তিনি নিজে ছাত্রাবাস পরিদর্শন করিতে যান এবং প্রধান শিক্ষকের সহিত পরামর্শ করিয়া তাহাদের চিত্তবিনোদনের উপযোগী নানাপ্রকার সদুপায় উদ্ভাবন করেন। ছাত্রাবাসের ছাত্রেরা ক্রমশঃ শরৎচন্দ্রের নিজ সন্তানের ন্যায় স্নেহের পাত্র হইয়া উঠিল। আহার বিহারে, শয়নে স্বপনে, সর্ব্বদা তাহাদের হিতচিন্তা তাঁহার অন্তরে জাগরূক থাকে। নানাস্থানের অপরিচিত লোকদের ছেলেরা ক্রমে ক্রমে তাঁহাকে আপনার লোক—গুরুজন বলিয়া মনে করিতে লাগিল। শরৎচন্দ্র অবসর পাইলেই তাহাদিগকে দেখিতে যাইতেন। তিনি যখন তাহাদিগকে দেখিতে যাইতেন, তাহারা মনে করিত যেন তাহাদের পিতা কিম্বা অন্য কোন ঘনিষ্ঠ আত্মীয় তাহাদিগকে দেখিতে আসিয়াছেন। শরৎচন্দ্র এমন কি করিলেন, যাহাতে কোমলমতি বালকগণ পিতামাতা হইতে দূরদেশে থাকিয়া তাঁহাকে আপনার লোক বলিয়া মনে করিতে লাগিল। তিনি যখন ছাত্রাবাস পরিদর্শন করিতে যান, তখন সকল বালক আপন আপন ক্ষুদ্র হৃদয়ের দ্বার উদ্ঘাটন করিয়া সকল কথাই তাঁহাকে বলিয়া থাকে। বালকেরা সমবেত হইয়া তাঁহার চারি দিকে দণ্ডায়মান হয়, এবং নানাপ্রকার কৌতুকাবহ গল্প দ্বারা তাঁহার আনন্দবর্দ্ধন করিয়া থাকে। গোপাল আগে দুধ ভাত খাইয়া শেষে ডালমাখা ভাত খাইয়াছে, মনমোহন ঘুমাইতে

ঘুমাইতে পড়িয়া গিয়াছে, তার মাথায় লাগিয়াছে, সুবোধ কলম কাটিতে গিয়া ছুরিতে হাত কাটিয়াছে, সুশীল গরম দুধ খাইতে গিয়া গাল পোড়াইয়া ফেলিয়াছে, হেমন্ত পেটের অসুখে কাপড়ে বাহ্যে করে, নিজেই কাঁদিয়া আকুল, বসন্ত তাই দেখে খুব হাসিয়াছিল বলিয়া মাষ্টার মহাশয় তাহাকে খুব তিরস্কার করিয়াছিলেন—প্রভৃতি নানাবিধ বিষয় যাহা তাহাদের ক্ষুদ্র সংসারে সর্ব্বদা ঘটিয়া থাকে, তাহা অকপটে তাঁহার নিকট বলিয়া সুখী হয়, এই সকল ঘটনার ভিতর দিয়া শরৎচন্দ্র তাঁহার প্রাণের স্নেহ ও সদ্ভাব তাহাদিগের প্রাণে ঢালিয়া দিয়া থাকেন। তাঁহার মিষ্ট কথায় ও ভালবাসাপূর্ণ উপদেশে তাহারা তৃপ্তি অনুভব করে ও উপকৃত হয়। প্রধান শিক্ষকমহাশয়, শরৎবাবুর সাহায্যে নিজের এই গুরুতর কর্ত্তব্য সুন্দররূপে সম্পন্ন করিতে লাগিলেন।

শরৎচন্দ্র বালকগণের সহিত কেবল আত্মীয়তা করিয়া এবং তাহাদের নিকট সময়ে সময়ে তাহাদের ক্ষুদ্র সংসার সম্বন্ধীয় নানাবিধ গল্প শুনিয়া ক্ষান্ত থাকেন না। তিনি নিজেও নানাপ্রকার গল্প দ্বারা তাহাদের চিত্তরঞ্জন করিয়া থাকেন। তাঁহার গল্পের মধ্য দিয়া তিনি এমন সকল বিষয়ের অবতারণা করেন, যাহাতে বালকদের হৃদয়ে ন্যায়ানুষ্ঠানের ভাব, সত্যবাদিতার ভাব, পরোপকারের ইচ্ছা সুন্দররূপে অঙ্কিত হইয়া যায়। কে কোথায় পরের দুঃখ দূর করিবার জন্য আত্মসুখ বিসর্জ্জন দিয়াছে, কে কোথায় সত্য কথা বলিতে গিয়া বিপদে পড়িয়াও ভীত হয় নাই, কে কোথায় গরিবের পক্ষ সমর্থন করিতে গিয়া ধনীর বিরাগভাজন হইয়াও অকুতোভয়ে কর্ত্তব্যের পথে অগ্রসর হইয়াছে, অন্য লোকের প্রাণ রক্ষার জন্য, কে কোথায় নিজের প্রাণ বিসর্জ্জন করিতে কুণ্ঠিত হয় নাই, সংসারের নানাপ্রকার আশা ভরসা নির্ম্মূল হইলেও, কে কোথায় দৃঢ় প্রতিজ্ঞা সহকারে জীবনের পথে

—কর্ত্তব্যের পথে—ধর্ম্মকর্ম্মের পথে, অগ্রসর হইয়াছে—এরূপ বিষয় লইয়াই তাঁহার গল্প সকলের অবতারণা করিতেন, বালকেরা অতিমাত্র ব্যস্ততার সহিত তাঁহার মুখের দিকে তাকাইয়া গল্প শুনিয়া থাকে এবং শুনিতে শুনিতে একবারে মোহিত হইয়া যায় এবং তদ্দারা নানাপ্রকার সদ্দৃষ্টান্ত লাভ করিয়া উপকৃত হয়।

তিনি যে কেবল নানাবিধ গল্পের দ্বারা তাহাদিগকে সদুপদেশ দিয়া ক্ষান্ত থাকিতেন, তাহা নহে, তাহাদিগকে শিক্ষা দিবার জন্য তিনি মনোরমার সহিত পরামর্শ করিয়া আরও নানাবিধ উপায় অবলম্বন করিয়া থাকেন, তাহার আভাস ক্রমশঃ প্রকাশ পাইবে।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

শরতের অদর্শনে।

শরৎচন্দ্র যত্ন ও অধ্যবসায় সহকারে মনোরমার স্বাভাবিক সদ্গুণগুলিকে ফুটাইতে বিশেষ ভাবে চেষ্টা করিয়াছেন। সুশিক্ষা ও সুপরামর্শ পাইয়া মনোরমা এখন সকল প্রকার কার্য্যে শরৎচন্দ্রের সহকারিণী হইতে পারিয়া পরম সুখ অনুভব করিয়া থাকেন। মনোরমার উন্নতিলাভে শরৎচন্দ্র সহায়তা করিয়াছেন, এখন তিনি মনোরমার সুপরামর্শে অনেক কার্য্যে অগ্রসর হইতে সাহসী হন এবং তাহাতে কৃতকার্য্য হইয়া কৃতার্থ বোধ করেন। এইরূপ ভাবে নিজেদের ধর্ম্মবুদ্ধি ও শক্তি সামর্থ্যের অনুগত হইয়া জীবনের কর্ত্তব্য-পথে অগ্রসর হইতেছেন, এমন সময়ে মনোরমা সহসা একদিন শুনিলেন একটী অসহায়া বিধবা একটী অষ্টম বর্ষীয় বালক ও তদপেক্ষা অল্প বয়স্কা একটী বালিকাকে সংসারের পথে ছাড়িয়া দিয়া পরলোক গমন করিয়াছেন। বালক বালিকার আর এমন কেহ নাই যে তাহাদিগকে একটু আশ্রয় দিয়া ও চারটী

ভাত দিয়া অকাল মৃত্যু হইতে রক্ষা করে। এই সংবাদ পাইবা মাত্র মনোরমার প্রাণে দারুণ ক্লেশের সঞ্চার হইল। এই অনাথ বালক বালিকার জন্য কিছু করা যায় কি না, এই ভাবিয়া অধীর হইলেন। শরৎচন্দ্র আফিস হইতে আসিলে তাঁহার সহিত পরামর্শ করিবার জন্য অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছেন। সমস্ত দিন সকলপ্রকার কাজের মধ্যে সেই বিপন্ন শিশুদিগের কল্পিত বিষন্ন মুখ মনের কোণে উদয় হইয়াছে, সরল প্রাণা মনোরমা যেন অজ্ঞাতসারে তাহাদের জননী হইয়া বসিয়াছেন, দেখিতে দেখিতে সন্ধ্যা অতীত হইয়া গেল। শরৎচন্দ্র অন্যদিন এতক্ষণ গৃহে আসিয়া থাকেন। আজ তাঁহাকে দেখিবার জন্য, তাঁহার সহিত পরামর্শ করিবার জন্য, মনোরমার প্রাণ ব্যস্ত হইয়াছে—আজ তিনি মুহূর্ত্ত পর মুহূর্ত্ত গণনা করিতেছেন, দৈবযোগে শরৎ আজ বাড়ী আসিতে বিলম্ব করিতেছেন। ক্রমে মনোরমার প্রাণ অধীর হইয়া উঠিল, চিত্ত চঞ্চল হইয়া পড়িল, দরিদ্র বালক বালিকার পরিণামচিন্তা হইতে চিত্ত অজ্ঞাতসারে নিজ অকল্যাণ কল্পনায় নিযুক্ত হইয়াছে। এমন সময়ে বসন্তকুমার দৌড়িয়া আসিয়া বলিল, মা, গাড়ী আসিয়াছে। গাড়ী আসিয়াছে শুনিয়া মনোরমার প্রাণ আশ্বস্ত হইল—অশুভ কল্পনাসকল ক্ষণকালের জন্য চিত্ত হইতে তিরোহিত হইল। কিন্তু যখন শুনিলেন গাড়ীতে বট্‌ঠাকুর একলা আসিলেন, তাঁহার হৃদয়-দেবতা আসেন নাই, তখন ঘড়ির দিকে একবার তাকাইয়া মুখখানি একবারে বিবর্ণ হইয়া গেল, খোকার মায়ের দ্বারা খোকার বাবার নিকট হইতে শুনিলেন যে, সে দিন তিনি শরতের আফিসে আসিয়া তাহাকে পান নাই—সে অনেক আগে কোথায় চলিয়া গিয়াছে! কোথায় গিয়াছে কেহ বলিতে পারিল না। এই সংবাদে মনোরমার মুখখানি একবারে শুকাইয়া গেল, কণ্ঠরোধ হইল, আর কোন কথা কহিতে পারিলেন না। এরূপ

হইবার কারণ এই যে, শরৎ কখন সংবাদ না দিয়া কোথাও যান না। গুরুতর প্রয়োজন থাকিলেও শরৎ সংবাদ পাঠাইয়া দেন,আজ কেন এমন হইল, এই ভাবিয়া মনোরমার প্রাণ ব্যাকুল হইয়া উঠিল, কিন্তু কেহ বুঝিতে পারিল না। ব্যাকুলতা বৃদ্ধির আর একটী বিশেষ কারণ এই যে, অতি অল্প দিনের মধ্যে, শরতের তিন চারিটী ঘনিষ্ঠ বন্ধু অতি সামান্য পীড়াতে লোকলীলা সম্বরণ করিয়াছেন। তাঁহার স্মরণ হইল, শরৎ অনেক সময় দুঃখ করিয়া বলিয়া থাকেন, যাঁহারা একে একে চলিয়া যাইতেছেন, যাঁহাদের উৎসাহ, কর্ত্তব্যপরায়ণতা, নিষ্ঠা ও সত্যবাদিতার মধুর দৃষ্টান্ত হৃদয়কে সর্ব্বদা সবল ও সরস করিত—যাঁহাদের কার্য্যকলাপের স্মৃতিমাত্র প্রাণের সজীবতা সম্পাদন করে, যাহাদের অভাবে সংসারটা তাঁহার নিকট বনভূমিসদৃশ বা মরুপ্রায় বোধ হয়, যেন সংসারের মুখ ম্লান হইয়া গিয়াছে বলিয়া মনে হয়, সেই সকল বন্ধু-বর্গের সঙ্গে মিলিতে—তাঁহারা যেখানে আছেন, সেই দেশে—সেই অজ্ঞাত রাজ্যে যাইতে বড়ই ইচ্ছা হয়। এই কথাগুলি স্মরণ হইবা-মাত্র তাঁহার অন্তরের অপ্রসন্নতা আরও ঘনীভূত হওয়াতে চারিদিক অন্ধকার ও অবলম্বনশূন্য বোধ হইতে লাগিল। এরূপ অকারণ-সম্ভূত নানাপ্রকার অমঙ্গল কল্পনা তাঁহার হৃদয়ে স্থান পাইতে লাগিল। সহসা চক্ষে জল আসিল,তিনি তাঁহার শয়নকক্ষে প্রবেশ করিলেন। সহসা দ্বারে শব্দ শুনিয়া বিষাদমগ্নহৃদয়ে আশার সূত্র ধরিয়া আনন্দকণাকে প্রাণে তুলিয়া লইতে যাইতেছিলেন—ভাবিতে যাইতে ছিলেন, আজ খুব তিরস্কার করিব—কঠিন সাজা দিব—অনেক-ক্ষণ মুখভার করিয়া থাকিব—ইহার সমুচিত দণ্ড দিয়া—সুদ-সমেত ষোলআনা আদায় করিয়া তবে ছাড়িব। এমন সময়ে দেখিলেন, যাঁহার সমাগম কল্পনা করিয়া, এই মুহূর্ত্ত সময়-মধ্যে তিল প্রমাণ সুখকে পর্ব্বত প্রমাণ করিয়া সম্ভোগ

করিতে যাইতেছিলেন—তিনি আসেন নাই, শরতের আসিতে অনেক রাত্রি হইতেছে দেখিয়া, মনোরমার মা জানিতে আসিয়াছেন, শরৎ কোন সংবাদ দিয়াছে কি না। মনোরমা অশ্রুপূর্ণ চক্ষু দুটী অন্ধকারে আবৃত করিয়া ধীরে ধীরে উত্তর দিলেন, না, মা—আজ কোন খবর দেন্‌নি। মনোরমার মা বলিলেন রাত্রি অনেক হ'য়ে গেল, তুই তবে খাওয়া দাওয়া ক'রে নে। শরতের খাবার এই ঘরে এনে রেখে দিই। মনোরমা বলিলেন আমি এখন খাব না, তোমরা জল খেয়ে শোওগে, তিনি এলে আমি তাঁহাকে খাওয়াইব আমিও খাব। মাও একটু চিন্তিত হইলেন, কিন্তু কোন বিপদ গণনা না করিয়া, আস্তে আস্তে গিয়ে শয়ন করিলেন। রাত্রি যতই বাড়িতে লাগিল—মনোরমার প্রাণ মন ততই অধীর হইতে লাগিল, সমগ্র ধরা নিদ্রিত—মনোরমা জাগরিত, সমস্ত জীব জন্তু শান্ত ও সমাহিত, মনোরমা অশান্তির প্রজ্বলিত অগ্নিকুণ্ডে নিমজ্জিত। শয়নকক্ষের বাতায়ন খুলিয়া পথের দিকে, ফটকের দিকে, রাজপথের দিকে ব্যাকুল নেত্রে একএকবার তাকাইতেছেন, আর এক একটী উত্তপ্ত দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিতেছেন। কচ্চিৎ এক খানি শকট রাজপথ বাহিয়া যাইতেছে, তিনি মনে করিতেছেন, এইবার বুঝি আমার আঁধার হৃদয়ের মেঘরাশি ভেদ করিয়া শরৎচন্দ্র উদয় হইবেন, যেই সে গাড়িখানি তাঁহাদের দ্বার অতিক্রম করিয়া সোজা পথে চলিয়া যাইতেছে, অমনি তাঁহার চক্ষু দুটী আপনা আপনি মুদিয়া যাইতেছে, তাঁহার তীক্ষ্ণধার আশার আবেগ নিরাশার আঁধারে লুকাইতেছে, এইরূপে তিনি অনবরত আশার উচ্চ শিরে উঠিয়া নিরাশার গভীর তলে ডুবিতেছেন, আশা কুহকিনী এই ভাবে তাঁহাকে লইয়া খেলা করিতেছে, তিনি ইহার ক্রীড়াপুত্তলি হইয়া মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে যমযন্ত্রণা ভোগ করিতেছেন। আজ আকাশের দিকে তাকাইয়া তাঁহার বোধ

হইতেছে, যেন, নক্ষত্র সকল তাঁহার বিষাদে বিস্ফারিত হইয়া নৃত্য করিতেছে, রজনীর ঘন অন্ধকার তাঁহার হৃদয়ের বিষাদ-ঘনকে পরিহাস করিতেই যেন ক্রমশঃ শুক্লবসনা সুন্দরী সাজিয়া তাঁহাকে আলিঙ্গন করিতে আসিতেছে, রজনীর স্নিগ্ধ সমীরণ সুললিত হিল্লোলে প্রবাহিত হইয়া তাঁহার হৃদয়ের গভীর যাতনার পরিচায়ক দীর্ঘনিশ্বাসের উত্তাপকে শীতল করিয়া দিয়া তাঁহাকে পরিহাস করিতেছে, রাত্রের গভীর নির্জ্জনতা তাঁহার হৃদয়ের শূন্য ভাবকে আরও যাতনাময় করিয়া তুলিতেছে। মনোরমা অধীর হইয়া উঠাবসা করিতে করিতে রাত্রি যাপন করিলেন। ক্রমশঃ পূর্ব্বাকাশ সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বাভাস প্রকাশ করিল—গগন-প্রান্তে অন্ধকারের মধ্য দিয়া দিনমণির ভাবী উদয়ের ইঙ্গিত সকল প্রকাশ পাইতে লাগিল—পৃথিবীর নির্জ্জন প্রান্তে কোন নীরব শিল্পী যেন, আপনার শিল্প চাতুরী দেখাইবার জন্য গাঢ় কৃষ্ণবর্ণ মেঘখণ্ড সকলকে সমবেত করিয়া তাহাতে অগ্নি প্রদান করিয়াছেন, দেখিয়া বোধ হইতেছে যেন, ঊষাযজ্ঞ সমাপনার্থে যজ্ঞেশ্বর হোমকাষ্ঠ প্রজ্বলিত করিয়া তাহাতে ঘৃতাহুতি প্রদান করিলেন, ক্রমে প্রকৃতির দরবারে প্রভাত সঙ্গীত আরম্ভ হইল—জীবকুল জাগিয়া উঠিল—নীরব ধরা প্রাণীপুঞ্জের কোলাহলে পূর্ণ হইয়া গেল, কিন্তু মনো-রমার উদাস—অবসন্ন—ম্রিয়মাণ প্রাণ জাগিল না—কোলাহলপূর্ণ হইল না—প্রতিদিন প্রভাতে তাঁহার শোভনীয় অধর-প্রান্তে যে মৃদু হাসির সুমন্দ উচ্ছ্বাস দেখিতে পাওয়া যায়—তাঁহার সে মন-মোহন নয়নপ্রান্তে যে শান্তির স্থিরসৌদামিনীর স্নিগ্ধ প্রকাশ দেখিতে পাওয়া যায়—তাঁহার প্রতিদিনের প্রভাত সম্ভাষণের বর্ণে বর্ণে যে অমৃত কণা ক্ষরিয়া থাকে—আজ তাহার কিছুই নাই—আজ প্রাতে বালক বসন্তকুমার উঠিয়া মায়ের নিকট তেমন আদর পাইল না—বাবার কথা জিজ্ঞাসা করিতে সাহস হইল না।

নবম পরিচ্ছেদ।

পত্র প্রাপ্তে।

শরৎ আফিসে আসিয়া একখানি পত্র পাইলেন—পত্রখানি পাঠ করিতে তাঁহার হৃদয় কাঁপিতে লাগিল। পত্র পাঠে মুহূর্ত্তেকের জন্য হতবুদ্ধি হইয়া বসিয়া রহিলেন, শেষে কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া ক্ষণকাল আফিসের বারেণ্ডায় পাইচারি করিতে করিতে সহসা কি স্থির করিয়া সাহেবের ঘরে গেলেন এবং বিদায় লইয়া আফিস হইতে কোথায় চলিয়া গেলেন, কেহ জানিতে পারিল না, পত্র খানি এইঃ—

প্রিয় শরৎ, তোমার বাড়ীতে অনেকবার গিয়াছি—গে'লে আর ফিরিতে ইচ্ছা হয় না। তুমি মরণশীল সংসারে নন্দনকাননের সুখ সম্ভোগ করিতেছ। এই একই সংসার কাহাকেও অশান্তির অগ্নিকুণ্ডে, কাহাকেও বা শান্তির সুখময় সরোবরে ডুবাইতেছে, কাহাকেও নরকের পুতিগন্ধময় অন্ধকারে, কাহাকেও বা নন্দনকাননের পারিজাত-পরিমলপূর্ণ পরম তৃপ্তিপ্রদ প্রাসাদে স্থান দিতেছে। তোমার সুখে আমার চক্ষু টাটায় না—তোমার আরামে আমি মরমে মরি না—আমি তোমার এ সকলের পক্ষপাতী—আমায় বলিতে পার, এক সংসারে, এক গৃহে, এক অবস্থায় জন্ম গ্রহণ করিয়া, কোন্ পুণ্য-বলে তুমি এমন আরামে, এমন আনন্দে, এমন সুখে, কাল যাপন কর, আর আমি কোন্ অপরাধে কোন্ পাপে, কোন্ বিধিলিপির বিপাকে, সেই সংসারে জন্মগ্রহণ করিয়া এত কষ্ট পাইতেছি? আমার হৃদয়টা ভাঙ্গিয়া দেখাইবার হইলে দেখাইতাম, এ হৃদয়ে দয়া মায়া, স্নেহ মমতা, আশা ভরসা, লোককে সুখী করিবার ও নিজে সুখী হইবার প্রবল

আকাঙ্ক্ষা নিরন্তর জাগিয়াছে, কিন্তু হায় আজ আর তাহাদের কাহাকেও প্রাণের কোণে দেখিতে পাইনা। ঘোর অন্ধকারে সমস্ত আবৃত,প্রাণের আশা ভরসার পূর্ণচন্দ্র আজ বিধির বিপাকে রাহু-গ্রস্ত, আজ হৃদয় অমাবস্যার অন্ধকারময় শ্মশানভূমি, কখন দৈবাৎ কেবল এক একটী শৃগাল কুক্কুরের ডাকমাত্র শুনিতে পাওয়া যায়। বলিতে পার কি, নিত্যসুখের সুমিষ্ট ধারা-সিঞ্চিত তোমার ঐ হৃদয়-প্রাসাদই সংসার—না আমার এই ঘোর বিষাদভরা আঁধার হৃদয়-কুটীরই সংসার—ঐটা স্বর্গ,এটা সংসার,না ঐটা সংসার,এটা নরককুণ্ড ? আমি আর এ নরক-যন্ত্রণা ভোগ করিতে পারি না। যাঁহারা আমাকে এ নরকে ডুবাইয়াছেন তাঁহাদের নিন্দা করি না, কারণ তাঁহারা আমার গুরুজন। তুমি কি একবার দেখা দিয়া, একবার তোমার সেই সৌম্য-মূর্ত্তি দেখাইয়া, তোমার মিষ্ট কথা শুনাইয়া, সুপরামর্শ দিয়া আমাকে তুলিয়া ধরিতে পার না ? আজ কি যাতনায় যে হৃদয় দহিতেছে, তাহা বলিয়া বুঝাইবার নহে। একবার আসিয়া স্বচক্ষে দেখিলেই বুঝিতে পার যে শত সর্প দংশনের জ্বালা আমি উপেক্ষা করিতে পারি—শত দস্যু শত খানি শাণিত তরবারি সহকারে আক্রমণ করিলেও হাসিয়া উড়া-ইয়া দিতে পারি, কিন্তু যাহার প্রেমালিঙ্গনের রেণুতে রেণুতে জীবন প্রবাহিত হইবে, তাহার বিষময় তীব্র বাক্য-যন্ত্রণা, আর সহ্য হয় না,যাহার অধরপ্রান্তে উদিত হাস্য-রেখায় আমার হৃদয়ে সৌদামিনী ক্রীড়া করিবে, তাহার চির অশান্তিপূর্ণ কোপন দৃষ্টিতে পুড়িয়া মরিলাম, যাহার প্রেমপাশে সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হইয়াও আপনাকে সুখ ও শান্তিতে চিরমগ্ন দেখিয়া, নিজেকেই ভাগ্যবান ভাবিয়া কৃতার্থ হইব, তাহাকেই দস্যু অপেক্ষা ভয়াবহ ভাবিয়া নিরন্তর তাহা হইতে দূরে আছি। একবার আসিয়া আমাকে ধর—আমাকে রক্ষা কর—নতুবা এ সংসারে আর আমাকে——

তোমারই নীতি।

শরতের আর কাহাকেও কিছু বলিবার অবসর হইল না। নানা প্রকার চিন্তা এক কালীন মনের মধ্যে উদয় হইয়া তাঁহার মনকে বিচলিত ও অধীর করিয়াছে, তাতে আবার রেলের পথে যাইতে হইবে, সুতরাং ব্যস্ততার মধ্যে বাড়ীতে সংবাদ দিতে ভুলিয়া গেলেন। বেলা সাড়ে বারটার সময় হাবড়া ষ্টেশনে গাড়ীতে উঠিয়া সীতানাথের গৃহে চলিলেন।

দশম পরিচ্ছেদ।

সীতানাথের গৃহে।

সীতানাথ তাঁহার মাসতুতো ভাই। শৈশবে একত্রে মাতামহ-গৃহে থাকিয়া প্রতিপালিত হইয়াছেন—এক বিদ্যালয়ে পড়িয়াছেন, এক খেলা খেলিয়াছেন, এক পাতে খাইয়াছেন সুতরাং সীতানাথ তাঁহার পত্রে মনের আবেগের, চিত্ত-বিপর্য্যয়ের আভাসের মধ্যে যে অনুযোগ করিয়াছেন তাহা সম্পূর্ণ সঙ্গত এবং স্বাভাবিক। এই জন্যই শৈশব জীবন দেখিয়া ভাবী জীবনের অঙ্কপাত করা যায় না। এই জন্যই ভারতবর্ষীয় তত্ত্বদর্শী ঋষিরা পুনর্জ্জন্ম ও কর্ম্মফল তত্ত্ব স্বীকার করিয়া এই গভীর অন্ধকারময় প্রহেলিকার মীমাংসা করিয়া গিয়াছেন। শরৎ অপেক্ষা সীতানাথ বিদ্বান ও ধনবান হইয়াও সংসারে সুখের পরিবর্ত্তে দুঃখের তীব্র কশাঘাতে অধিকতর জর্জ্জরিত। কেন এমন হইল কে এ প্রশ্নের উত্তর দিবে? সীতানাথের পিতা রমানাথ সম্পন্ন লোক হইলেও কর্ম্মকাজের অনু-রোধে তাঁহাকে নানা স্থানে থাকিতে হইত। এজন্য সীতানাথ শৈশবে অনেক সময় মাতুলালয়ে শরতের সহিত একত্রে বাস

করিয়াছেন। সীতানাথের বাসস্থান শ্রীরামপুর—কর্ম্মস্থান বর্দ্ধমান। তিনি সেখানে ম্যাজিষ্ট্রেটের হেড্ ক্লার্ক। শরৎচন্দ্র আপাততঃ বর্দ্ধমানেই গিয়াছেন। সীতানাথের পিতা কোন সম্ভ্রান্ত জমীদারের গৃহে তাঁহার বিবাহ দিয়াছেন। ধনীর সুন্দরী কন্যা বিবাহ করিয়াছেন—তাঁহার বিবাহে ঃ—

ফুটেছে চম্পক ফুল, বাতে বাস নাহি বয়,
কমলিনী শোভিয়াছে, সৌরভ নাহি মিলয়।

কেন এমন হইল ? সম্ভ্রান্ত ঘরের কন্যা সকল প্রকার সুশিক্ষার ভিতরে লালিত পালিত, তবে কেন এমন হইল ? গৃহে সুখ শান্তি সম্ভোগের যে সকল উপকরণ থাকা নিতান্ত আবশ্যক তাহা সীতানাথের গৃহে প্রচুর পরিমাণে আছে, তবে সুরমা কেন সুখের সংসারকে অশান্তির আগুনে পোড়াইতেছেন ? কে বলিবে [illegible] পোড়াইতেছেন ? শরৎচন্দ্র যথাসময়ে বর্দ্ধমান পৌঁছিলেন। সীতানাথের বাসায় উপস্থিত হইয়া দেখেন সীতানাথ বিষণ্ণ মনে একাকী বাহিরের ঘরে বসিয়া আছেন। শরতকে দেখিয়া অজস্র ধারে চক্ষের জল ফেলিতে লাগিলেন। শরৎ বয়সে কয়েক মাসের ছোট হইলেও সীতানাথকে দাদা বলিয়া ডাকেন না—সীতি বলিয়া ডাকেন। অনেক মিষ্ট কথায় সীতিকে শান্ত করিয়া শেষে সমস্ত ব্যাপারটা আদ্যোপান্ত শ্রবণ করিলেন। সীতি নিজের বক্তব্য বিষয় শেষ করিয়া নিজের পকেট হইতে এক খানি ছুরি বাহির করিয়া বলিলেন—তুমি আসিয়া আমার মরণে বাদ সাধিলে, তা না হইলে, আজ রাত্রে এই ছুরি নিজের বুকে বসাইয়া দিতাম। শরৎ দেখিয়া অবাক হইয়া ক্ষণকাল বসিয়া রহিলেন,তাহার পর সীতির হাত হইতে ছুরিখানি লইয়া নিজের নিকট রাখিয়া দিলেন, বলিলেন—সংসারে নানা প্রকার অবস্থার ভিতরে পড়িয়া মানুষ কোথায় আত্ম-সংযম শিখিবে, না তুমি ঠিক তাহার বিরুদ্ধ আচ-

রণে—পাপ কার্য্যে অগ্রসর হইতেছ? সীতানাথের চক্ষু হইতে অগ্নিকণাসকল নির্গত হইতে লাগিল—ক্রোধকম্পিত কলেবরে উঠিয়া দাঁড়াইলেন,দাঁড়াইয়া বলিলেন—আমি কি পাপ করিতেছি? আমার মত অবস্থায় পড়িয়া আমারই কত বন্ধু সুরা-সাগরে ডুবিয়া অন্তরের যাতনা ভুলিতেছে—কত লোক নিজেদের অপ্রসন্ন চিত্তের শান্তি বিধানের জন্য—অতৃপ্ত বাসনার তৃপ্তি বিধানের জন্য, পাপ-ময় কূপে ডুবিয়া আত্মহত্যা করিতেছে, আমি কি করিয়াছি? জীবন দুঃসহ যাতনাময় হইয়াছে বলিয়া জীবনের অন্তিমকাল কামনা করিতেছি, ইহাতে আর অপরাধ কি—পাপ কি—কেন ন্ব না?

'। তুমি ইহা অপেক্ষা হীন কার্য্যে রত হও নাই, এটা কি প্রশংসার কথা? নানা প্রকার দুঃখ কষ্টের ভিতরে পড়িয়াও র দিকে তাকাইয়া জীবন-পথে অগ্রসর হওয়াই সজ্জনের তুমি সে কর্ত্তব্য হইতে বিরত হইতেছ কেন?

াতা। আঃ—জ্বালাতন করিও না, তোমার ব্রাহ্মগিরি .খয়া দাও।

শরৎ। আমিত আর ব্রাহ্ম নই, তবে ঐ কথা, অথবা ঐরূপ কথা বলিলেই যদি ব্রাহ্ম হয়, তবে ব্রাহ্ম হওয়াই ভাল।

সীতা। আমিত ব্রাহ্ম হওয়াকে নিন্দা করি নাই। আর তুমি ব্রাহ্ম নও, একথাও আমি ভাবি নাই।

শরৎ। ব্রাহ্ম হইতে পারিলে সুখী হইতাম—অনেক ত্যাগ-স্বীকার করিতে পারিলে, তবে ব্রাহ্ম হওয়া যায়। কিন্তু ব্রাহ্ম হওয়া ভাল কি মন্দ, সে বিচার থাক, এখন তুমি কিসে সাম্‌লাও আগে সে উপায় দেখ।

সীতা। আমি ম'রে সাম্‌লাব, সংসারে আর আমার সাম্‌লাবার উপায় নাই।

শরৎ। চল দেখি, একবার ব'য়ের সঙ্গে দেখা করিগে।

সীতা। তোমার গরজ থাকে দেখা করগে, আমি যাব না।

শরৎ। আমার ত আর তাঁর সঙ্গে বেশী জানা শুনা নাই, যা আছে তাতে তুমি না থাকিলে এসকল কথা বলিবার সুবিধা হইবে না।

সীতানাথ একটা চাকরকে ডাকিয়া বলিলেন—বাড়ীর ভিতরে বলে আয়, শরৎ বাবু আসিয়াছেন, শীঘ্র কিছু জলখাবার চাই।

শরৎ আসিয়াছেন শুনিয়া, সুরমা তৎক্ষণাৎ লুচি ও তরকারি প্রস্তুত করাইলেন এবং বাজার হইতে কিছু ভাল সীতাভোগ ও মিহিদানা আনাইলেন! জলখাবার প্রস্তুত করিয়া বাহির বাটীতে সংবাদ দিলেন। শরৎ ও সীতানাথ দুইজনে বাড়ীর ভিতরে প্রবেশ করিলেন।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

গৃহ সজ্জার অন্তরালে।

শরৎ সীতানাথের সহিত তাঁহার শয়নকক্ষে গিয়া উপবেশন করিলেন। কক্ষটী অতি সুন্দররূপে সজ্জিত, দেখিলেই বোধ হয় শৃঙ্খলা ও পারিপাট্য শিখিবার আদর্শ স্থল। যেখানে যে দ্রব্যটী রাখিলে দেখিতে ভাল দেখায়, তাহাতে মনোযোগের অভাব হয় নাই, দেওয়ালের যে দিকে যে ছবিখানি বসাইলে গৃহের শোভা ও ছবির গৌরব বৃদ্ধি হয়, সেদিকে দৃষ্টি রাখিয়া ছবিগুলি বসান হইয়াছে। পুস্তক গুলির দিকে তাকাইলে বোধ হয় যেন পুস্তকগুলি স্ব স্ব পদমর্য্যাদা অনুসারে আপন আপন নির্দ্দিষ্ট স্থান অধিকার করিয়াছে। অন্যান্য গৃহসজ্জাও গৃহস্থের সুরুচি, সুবিবেচনা ও কবিত্বের

সুন্দর পরিচয় দিতেছে। সংক্ষেপে সীতানাথের ঘরে গিয়া বসিলে আরাম পাওয়া যায়—গৃহসজ্জার দিকে তাকাইলে তাকাইয়া থাকিতে ইচ্ছা হয়—চক্ষু ফিরাইতে পারা যায় না, কিন্তু তবুও যেন কিছু অভাব রহিয়াছে বলিয়া মনে হয়—যেন পূজার বিজয়ার দিনের প্রাণবিহীন প্রতিমার ন্যায়—বস্ত্রালঙ্কারে সুসজ্জিত মৃতদেহের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল—শরৎ ও সীতানাথ দুই জনে বসিয়া নানাবিধ গল্প করিতে লাগিলেন। শরৎ নানাপ্রকার কথা বার্ত্তার মধ্য দিয়া সীতির চিত্তচাঞ্চল্য দূর করিতে চেষ্টা করিতেছেন, এমন সময়ে সুরমা জল খাবার লইয়া আসিলেন। শরৎ সুরমাকে আসিতে দেখিয়া নিজে হাসিমুখে একটু অগ্রসর হইয়া তাঁহার হাত হইতে খাবারের রেকাবি দুখানি ধরিলেন। সুরমা সলজ্জভাবে দু একবার বারণ করিয়া শেষে শরতের হাতে জল খাবারের পাত্র দিয়া ঘরের বাহিরে দাঁড়াইয়া কথা কহিতে লাগিলেন। ঝি জল দিয়া পান আনিতে গিয়াছে। শরৎ বউঠাকুরুণ্‌কে ঘরে আসিতে বার বার অনুরোধ করিতে লাগিলেন,কিন্তু তিনি কিছুতেই সম্মত হইতেছেন না দেখিয়া শরৎ খাইতে খাইতে উঠিয়া গিয়া বলিলেন—তুমি গিয়ে না বল্লে দাদা খাবেন না। আর আমার খিদে পেয়েছিল বলে, নির্লজ্জের মত খাইতেছিলাম তাহাও বন্ধ করিতে হইবে। তুমি এস—

সুরমা। আমাকে মাপ কর, আমি ঘরের ভিতর যাবনা।

শরৎ। কেন আস্‌বে না? ঘরে কি এস না?

সুরমা। (একটু হাসিয়া) যাবনা কেন? এখন যাব না।

শরৎ। কেন আমি এসেছি বলে—আচ্ছা আমি বাহিরে চলিলাম—এই বলিয়া বাহিরে যাইতে উদ্যত।

সুরমা। না না, তুমি এসছ, বলে নয়—যদি বা যেতুম, তুমি বাহিরে গেলে আর মোটেই যাব না।

শরৎ। তবে আর জ্বালাও কেন? এস না। তুমি ঘরে গেলে—খেতে বল্লে যদি দাদা খান, তবে বাহিরে দাঁড়াইয়া থেকে কষ্ট দিয়ে লাভ কি?

সুরমা। ঘরটা ত আর তোমার ঘর নয়, যে তুমি ডাকিলেই যাব? যার ঘর তিনি ডাকিলেই যাব।

শরৎ। তাই বল না কেন, আমার ডাকের দাম নেই।

সুরমা। তোমার বাড়ীতে গেলে,তোমার ডাকের দাম হবে। পরের ঘরে বস্‌তে ডেকে বাহাদুরি দেখ্‌য়ে লাভ কি?

শরৎ। সীতির দিকে তাকাইয়া, একবার ডাক না—না ডাকলে রাঙ্গা চরণ দেখ্‌তে পাবে না।

সীতি বিরক্ত হইয়া বলিলেন—যে না ডাকিলে আস্‌বে না, তাকে ডেকে আনার দরকার কি? "যেচে মান আর কেঁদে সোহাগ" করে কি কিছু দাম বাড়ে?

অনেকক্ষণ এইরূপে কথা কাটাকাটির পর সুরমা দেবরের অনুরোধেই ঘরের ভিতর আসিয়া স্বামীর নিকটে দাঁড়াইলেন এবং তাঁহাকে জল খাইতে বলিলেন। দুই তিন বার বলার পর সীতানাথ একটু প্রসন্ন ভাব ধারণ করিলেন এবং আস্তে আস্তে জল খাইতে আরম্ভ করিলেন।

শরৎ। দাদা এটা কি তোমার শ্বশুরবাড়ী যে সঙ্কুচিঁড়ে কাট্‌ছ?

সীতি। দেখ, তোমাকে বাঁদ্‌রামি করবার জন্যে ডাকিনি।

শরৎ। তুমি বাঁদ্‌রামি করবার জন্যেই ডেকেছ, কিন্তু আমি বাঁদ্‌রামি করবার জন্যে আসিনি, তবে তোমার রকম সকম দেখে যা মনে হচ্চে তাই বল্‌ছি।

সীতি। বাঁদ্‌রামি করবার জন্যে ডেকেছি?

শরৎ। তা বই কি। স্বামী স্ত্রীতে ঝগড়া ক'রে পরস্পরের

মুখ দেখ না—অন্য লোক এসে তোমাদের ঝগড়া মিটাইয়া দিবে, এরূপ মনে করা বাঁদ্‌রামি ছাড়া আর কি হতে পারে?

সীতি। তোমাকে ত ঝগড়া মিটিয়ে দেবার জন্যে ডাকিনি। তুমি সুখে আছ সংসারে সুখভোগ করিতেছ, তাই তোমাকে একবার দেখবার সাধ হয়ে ছিল, আর তো———

শরৎ। তা বটে, ঠিক কথা, তুমি আমাকে দেখে মরবে বলে ডেকে ছিলে, আমি তোমার ছোট ভাই আমাকে একবার দেখে মরবে বলে আমায় ডেকেছ, বউ ঠাকৃরুণের দিকে ধরিয়া এই ছুরি খানা আজ রাত্রে বুকে বসাবেন, আমি এসে কেড়ে নেবো বলে আমাকে ডেকেছেন।

সুরমা সহসা একখানি শাণিত ছুরি দেখিয়া, আর সেই রাত্রে স্বামীর আত্মহত্যা করিবার সংকল্প শুনিয়া একবারে শিহরিয়া উঠিলেন—সহসা তাঁহার শরীর অবশ হইয়া পড়িল, তিনি পড়িয়া যাইতেছিলেন দেখিয়া শরৎ সীতিকে বলিলেন ধর—কোলে করে ধর, দেখ্‌ছ না বৌ পড়ে যান যে, সীতানাথ অন্য চিন্তা করিবার অবসর পাইলেন না, শরতের মুখের কথা বাহির হইতে না হইতে তিনি স্ত্রীকে ক্রোড়ে তুলিয়া বসিলেন, শরৎ দাসীকে শীঘ্র জল আনিতে বলিয়া নিজে পাখার বাতাস করিতে বসিলেন। মুখে ও মাথায় জল দিয়া ঘন ঘন পাখার বাতাস চলিতে লাগিল। শরৎ সব ঠিক করিয়া দিয়া ডাক্তার ডাকিতে যাইবেন এমন সময় একটু চেতনা লাভের আভাস পাইয়া শরৎ নিকটে আসিয়া বসিলেন। আস্তে আস্তে দুই তিন বার ডাকার পর একবার চক্ষু মেলিয়া আবার তৎক্ষণাৎ পুর্ব্ববৎ হতচেতন হইয়া পড়িলেন, কিন্তু ক্ষণে ক্ষণে মুখে এক প্রকার বিষাদের ভাব দেখা যাইতে লাগিল যেন অন্তরের গভীর স্থানে আঘাত লাগিয়াছে বলিয়া বোধ হইল। সে মুখের ভাব দেখিয়া স্পষ্টই বোধ হইল যেন পূর্ণিমার চন্দ্র রাহু-

গ্রস্ত হইয়া কাঁপিতেছে সে বিষাদভারাক্রান্ত প্রাণের গভীর যন্ত্রণা মুখে প্রতিফলিত হইয়াছে, দেখিয়া বোধ হইল যেন অত্যল্পকাল মধ্যে কি ঘোর দুর্ঘটনা ঘটিবে তাহারই পূর্ব্বলক্ষণ প্রকাশ পাইতেছে। সীতানাথের মুখখানি শুকাইয়া গিয়াছে, প্রাণে আতঙ্কের সঞ্চার হইয়াছে, হৃদয় দুরু দুরু কাঁপিতেছে, শরীর অবশ হইয়া আসিতেছে। শরৎ অপ্রস্তুত হইয়া নীরবে বসিয়া সুরমার মুখের ভাব দেখিয়া হৃদয়ের অবস্থা নির্ণয় করিতেছেন। এই অবস্থায় প্রায় এক ঘণ্টাকাল অতীত হইল, কিন্তু অবস্থার কোন পরিবর্ত্তন না দেখিয়া শরৎ সীতানাথকে জিজ্ঞাসা করিলেন—ডাক্তার ডাক্‌বো কি? একবার জিজ্ঞাসা করিলেন, দুবার জিজ্ঞাসা করিয়া কোন উত্তর না পাইয়া, গা ঠেলিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—সীতি—ডাক্তার ডাক্‌বো কি? সীতি যেন নিদ্রোত্থিতের ন্যায় চমকিত হইয়া বলিলেন, হাঁ—তা—কি জানি, যা ভাল হয় কর, ডাক্তারকে কি বলিবে। শরতের এতক্ষণ এ কথা মনে উদয় হয় নাই, যে সকল কথা ভাঙ্গিয়া বলিতে হইলে সীতানাথের বিদ্যাবুদ্ধির পরিচয়টাও দিতে হইবে। তখন এইটীই শরতের চিন্তার বিষয় হইল। সীতানাথ এতক্ষণ সুরমার বিষয়ই ভাবিতে ছিলেন। সুরমার অহঙ্কার, কলহ ও গালাগালির কথা মনে উদয় হইল, তাঁহার প্রেম ভালবাসার অভাব, স্নেহ মমতার অভাব, ভক্তি শ্রদ্ধার অভাব ও এইসকল কারণে দূরে দূরে থাকার কথা মনে জাগিয়া উঠিল। তাঁহার ক্ষুদ্র বৃহৎ সকল প্রকার অপরাধ একত্র হইয়া পর্ব্বতাকার ধারণ করিল সত্য, কিন্তু একথাও মনে হইল যে তিনি যেন ভীরুর ন্যায়, কঠোরহৃদয় ব্যক্তির ন্যায়, সেই পর্ব্বত প্রান্তে দণ্ডায়মান হইয়া কেবল বলিয়াছেন,—"তুমি এই অপরাধ-ভার বহন করিতে অসমর্থ হইয়া শীঘ্র মরিবে। ইহাই তোমার জীবনাভিনয়ের স্মৃতিস্তম্ভ

হইবে। সে ক্ষুদ্রজীবনের নানা প্রকার ত্রুটি সংশোধন করিয়া তাহাকে নিজের উপযুক্ত করিতে—সদ্ভাব ও সুবিবেচনা সহকারে তাহাকে আপনার করিতে, কখনও প্রয়াস পান নাই। তাহার প্রধান কারণ এই যে, তাহার দোষ ধরিয়া তাহাকে অসুখী করা যত সহজ হইয়াছে, তাহাকে সুপরামর্শ দিয়া তাহার দোষ সংশোধন করিতে সাহায্য করা তত সহজ হয় নাই। ইহাতে সহিষ্ণুতা চাই, সদ্ভাব চাই, জ্ঞান চাই, ধর্ম্মভাব চাই, সর্ব্বোপরি তাহাকে আপনার করা চাই। সীতানাথ এক্ষণে অল্পে অল্পে আপনার দোষ দেখিতে লাগিলেন, ভাবিলেন যাহাকে আপনার করিতে পারি নাই, তাহার দোষ দেখিতে—খুঁত ধরিতে কেন গেলাম? আজ যাহা দেখিলাম তাহাতে ত এরূপ মনে করিতে পারি না যে সুরমা আমাকে কষ্ট দিয়া সুখ পায়—আমার দুঃখ যন্ত্রণাতে উদাসীন—আমাকে ভাল বাসে না—আমার উপর তাহার টান নাই, আমার এ ধারণা যে সম্পূর্ণ অমূলক, আজ সে তাহার প্রমাণ দিয়াছে। ওর যদি দোষ থাকে তবে আমিও উহার অপেক্ষা একটুও অল্প অপরাধী নহি।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

পথে পথে।

তিল তিল করিয়া বেলা বাড়িতে লাগিল, লোকের গতিবিধি, কথা বার্ত্তা, হাসি কান্না, পশু পক্ষীর কলরবে চারিদিক পূর্ণ হইয়া গেল, ক্রমে এত বেলা হইল যে শরতের বাড়ী আসিবার আশা ধীরে ধীরে লোপ পাইতে লাগিল। মনোরমা এতক্ষণও শান্তভাবে সহ্য করিতেছিলেন, তাঁহার দৃঢ় ধারণা হইল যে

স্বামী কোন গুরুতর বিপদে পড়িয়াছেন। এমন বিপদে পড়িয়াছেন যে সংবাদ দিবারও সামর্থ্য নাই। এই ভাবিয়া তিনি একাকিনী বসিয়া অজস্রধারে অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন। মনোরমার মা, ও খোকার মা তাঁহার অবস্থা দেখিয়া অত্যন্ত কাতর হইলেন, এবং ব্যস্ত হইয়া রামগোপাল বাবুকে একবার সংবাদ লইতে অনুরোধ করিলেন। রামগোপালবাবু কোথায় সন্ধান লইবেন কিছুই স্থির করিতে না পারিয়া হতবুদ্ধি হইয়া ক্ষণকাল বসিয়া রহিলেন। শেষে গাড়ী লইয়া বাহির হইলেন। কলিকাতার যে সকল বন্ধুদের নিকট শরৎ সর্ব্বদা গিয়া থাকেন, সে সকল স্থান অনুসন্ধান করিলেন। কোথাও সন্ধান পাইলেন না। কেহ কোন কথা বলিতে পারিল না। হত বা অহত হইয়া মেডিকেল কালেজে যদি পড়িয়া থাকেন, এ চিন্তা মনে উদয় হওয়ায় একবার সেখানেও সন্ধান করিলেন, কোথাও কোন সন্ধান পাইলেন না, আফিসের বেলা অতীত হইয়া গিয়াছে। নিজের আফিসে গিয়া সাহেবকে বলিয়া চলিয়া আসিলেন। শরতের আফিসে আসিয়া পূর্ব্ব দিনের ন্যায় নিরাশ হইয়া বাহির হইতেছেন,এমন সময়ে তাঁহার মনে হইল একবার শরতের সাহেবকে জিজ্ঞাসা করিলে হইত, কারণ সাহেব কোন সংবাদ দিলেও দিতে পারেন। সাহেবকে সংবাদ দিবা মাত্র সাহেব রামগোপালবাবুকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। রামগোপালবাবু সাহেবের নিকট জিজ্ঞাসা করিয়া কেবল এইটুকু জানিতে পারিলেন যে শরৎ "রেলে যাইতে হইবে" এই কথা বলিয়া বিদায় লইয়া গিয়াছেন। পরদিন আসিবেন কি না, কোন্ রেলে কোথায় গেলেন, তাহা কিছুই বলিয়া যান নাই। কেবল ১২॥ টার গাড়িতে যাইবার কথাটী সাহেব শুনিয়াছিলেন বলিয়া বোধ হইল। যদি আফিসে কোন সংবাদ আসে তাহা হইলে রামগোপাল বাবু শরতের বাড়ীর ঠিকানায়

সংবাদটী পাইবার প্রার্থনা জানাইলে, সাহেব বড় বাবুকে ডাকিয়া বলিয়া দিলেন যে শরৎবাবুর কোন সংবাদ আসিবামাত্র এই ঠিকানায় লোক পাঠাইয়া সংবাদ দিবে এবং কোথা হইতে সংবাদ আসে তাহাও লিখিয়া দিবে। বড় বাবু নত মস্তকে "যে আজ্ঞা" বলিয়া চলিয়া গেলেন। রামগোপাল বাবুও সাহেবকে কৃতজ্ঞতা জানাইয়া বাহিরে আসিলেন। গাড়ীতে উঠিয়া ভাবিতে লাগিলেন, "বেলা প্রায় ২টা বাজিতে যায় আর কি করিব, বাড়ী যাই" প্রাতে অনাহারে বাড়ীর বাহির হইয়াছেন, এতক্ষণ ভাবনা চিন্তার তাড়নায় ক্ষুধার অনুভূতি ছিল না। যত ভয়ের কারণ হইয়াছিল, তাহার গুরুত্ব অনেক পরিমাণে হ্রাস হইল, ক্ষুধার প্রকোপও দেখা দিল। কত কি ভাবিতে ভাবিতে বাড়ী যাইতেছেন। ১২॥টার সময়ে কোন্ রেলে কতদূর পর্য্যন্ত গাড়ী যায়, বাড়ী গিয়া একবার টাইম্ টেবল্‌খানা দেখিতে হইবে, এটাও ভাবিলেন। আজ শনিবার অধিকাংশ আফিস দুটার সময় বন্ধ হয়, সুতরাং রামগোপাল বাবু আফিস অঞ্চল অতিক্রম করিতে না করিতে রাজপথ লোকে পূর্ণ হইয়া গেল। তখন তাঁহার মনে হইল, ও সংবাদটা এখনই লইলে ভাল হয়, এই ভাবিয়া লালদীঘির নিকট দাঁড়াইলেন। সিয়ালদহের গাড়ীতে যাঁহারা যাইবেন—তাঁহাদের অনেককে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলেন যে ১২॥ টার সময়ে সিয়ালদহের কোন লাইনে গাড়ী নাই। তখন রামগোপাল বাবু বাড়ী না গিয়া হাবড়া ষ্টেসনে গেলেন। সেখানে অনুসন্ধানে জানিলেন যে ঠিক ১২॥ টার সময়ে একখানি গাড়ী প্রতিদিন হাবড়া হইতে যায় এবং তাহার নাম দিল্লী প্যাসেঞ্জার ট্রেণ। রামগোপাল বাবু প্রথমতঃ মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িলেন, শরৎ কোথায় গেল, কেন গেল, আর কি করিয়াই বা তাহার সংবাদ লইবেন, ক্ষণকাল

গাড়ীতে বসিয়া এই চিন্তা করিলেন। যে যে স্থানে শরতের পরিচিত লোক, বন্ধুবান্ধব কিম্বা আত্মীয় স্বজন আছেন জানিতেন সেই সকল স্থানের কোন কোন পরিচিত লোককে বলিয়া দিলেন যে তাঁহারা গ্রামে গিয়া সর্ব্বাগ্রে সংবাদটা লইয়া যদি জানিতে পারেন যে শরৎ সেখানে আছেন, অনুগ্রহ করিয়া ডাকে এক একটা সংবাদ পাঠাইয়া দেন যেন রবিবার প্রাতেই জানিতে পারা যায়। অনেক স্থানের পরিচিত লোকদের বলিয়া দিলেন সত্য, কিন্তু শরৎ যেখানে গিয়াছেন সেখানে সন্ধান লইবার মত কাহাকেও দেখিলেন না—কাহাকেও বলাও হইল না। রামগোপাল বাবু নিরাশ মনে বাড়ী ফিরিয়াছেন, এমন সময়ে বিমলা বাবু নামে তাঁহার এক বন্ধুর সহিত সাক্ষাৎ হইল। তিনি ডাক্তার, অনুসন্ধানে জানিলেন তিনি বর্দ্ধমান যাত্রা করিয়াছেন। কারণ অনুসন্ধান করিয়া কিছুই জানিতে পারিলেন না। আলাপের ভাবে বোধ হইল যেন কারণটা গোপন করিতে চাহিতেছেন, সুতরাং তাঁহাকে আর কোন কথা জিজ্ঞাসা করিতে সাহস হইল না। ওদিকে তাঁহার গাড়ীরও সময় হয়। তাঁহাকে ছাড়িয়া দিয়া কিয়দ্দুর আসিয়া তাঁহার চমক ভাঙ্গিল, তাঁহার স্মরণ হইল, বিমলা বাবু সীতানাথের ভায়রাভাই, আর সীতানাথ শরতের মাসতুতো ভাই—সীতানাথ বর্দ্ধমানে থাকেন। আবার ষ্টেসনে গেলেন, কিন্তু কেবল দৌড়াদৌড়ি সার হইল, তিনিও প্লাটফর্ম্মে গেলেন, গাড়ীও ছাড়িয়া দিল—লাভের মধ্যে এই হইল যে তাঁহার বন্ধুর সহিত দেখা হইল, কোন কথা হইল না—কেবল দূর হইতে চীৎকার করিয়া বলিলেন, "শরতের সংবাদ দিবেন" তিনিও সেইরূপ উচ্চকণ্ঠে "আচ্ছা" বলিয়া আশ্বাস দিয়া চলিয়া গেলেন। পরস্পর পরস্পরের কথা বুঝিতে পারিলেন কি না, তাহা কেহ বুঝিল না। রামগোপাল বাবু আর বিলম্ব না করিয়া বাড়ী গেলেন। যখন তিনি বাড়ী

পৌঁছিলেন তখন বেলা প্রায় চারিটা বাজে, এতক্ষণ তিনি বাড়ী আসেন নাই, শরতের কোন সংবাদ পাওয়া যায় নাই বলিয়া এখনও কেহ আহার করেন নাই। তাঁহার চোখে, মুখে ও মাথায় এক পর্দ্দা ধূলা জমিয়া গিয়াছে। দেখিয়া বোধ হইল যেন কত কাল ধরিয়া আহারাদি নাই, কোন সঙ্কটাপন্ন পীড়ায় বহুকাল ধরিয়া ভুগিয়াছেন। তাঁহাকে দেখিয়া বোধ হইল যেন শরতের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সমাপন করিয়া গৃহে আসিলেন। তাঁহার মুখ দেখিয়া কেহ তাঁহার নিকটে যাইতে কিম্বা তাঁহাকে কেহ কোন কথা জিজ্ঞাসা করিতে সাহস করিতেছেন না। রামগোপালবাবু ক্ষণকাল নীরবে বসিয়া বিশ্রাম করিয়া নিজেই বসন্ত-কুমারকে ডাকিয়া বলিলেন—জ্যাঠামশাই তোমার মাকে বল, তোমার বাবা রেলে চ'ড়ে কোথায় গিয়াছেন, কোন ভয় নাই। রামগোপাল বাবু কথা কহিবামাত্র সকলেই আসিয়া তাঁহাকে ঘিরিয়া দাঁড়াইল, মনোরমা দূর হইতে খোকার মাকে ডাকিয়া বলিলেন—দিদি বটঠাকুরকে আগে হাতে মুখে জল দিতে বল, আমি এই সরবতটা করিয়া রাখিয়াছি, এটা খাওয়াইয়া দাও, তার পর সকল কথা শুনিবে। খোকার মা হাত মুখ ধোওয়ার জল আনিয়া কর্ত্তাকে হাত মুখ ধুইতে বলিলেন, ঝিকে গামছা আনিতে বলিয়া নিজে বাতাস করিতে লাগিলেন। হাত মুখ ধোওয়া হইল। মনোরমা সরবত লইয়া একটু দূরে দাঁড়াইয়াছিলেন এখন একটু অগ্রসর হইয়া খোকার বাবার নিকট রাখিয়া দিলেন। তৎপরে রামগোপালবাবু প্রাতঃকাল হইতে তিনি ক্রমে ক্রমে কি করিয়াছেন, তাহার আনুপূর্ব্বিক বিবরণ সকলকে বলিতে লাগিলেন।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

শরতের গৃহে।

শরৎ ও সীতানাথ সুরমাকে সেই একরূপ অবস্থাতে লইয়া সমস্ত রাত্রি যাপন করিলেন। রোগী সমস্ত রাত্রি জীবন মৃত্যুর মধ্যে সংগ্রাম করিতে করিতে সীতানাথ ও শরতের মনে ক্ষণে ক্ষণে আশা ও নিরাশার সঞ্চার করিতে করিতে রাত্রি কাটাইয়া দিলেন; সুরমাকে শয্যাতে শয়ন করাইয়া সীতানাথ সমস্ত রাত্রি তাঁহার শয্যা পার্শ্বে বসিয়া কাটাইয়াছেন। কতবার যে নীরব অশ্রু-বিন্দু সকল নয়নপ্রান্তে সমবেত হইয়াছে—নয়নের আবরণ উল্লঙ্ঘন করিয়া ধারাবাহি হইয়াছে—কতবার উত্তপ্ত অশ্রুকণাসকল গণ্ড ও বক্ষঃসিক্ত করিয়া প্রবাহিত হইয়াছে। কত শত শত দীর্ঘ নিশ্বাস প্রবলবেগে নির্গত হইয়া সুরমার সুশীতল বারিসিক্ত মুখমণ্ডলের সজীবতা সম্পাদন করিতে প্রায়াস পাইয়াছে। সুরমার বাল্য-চপলতা ও তীব্রভাষা তাঁহার হৃদয়ে যে দারুণ অতৃপ্তি ও বিদ্বেষ ভাব জাগাইয়াছে তাহারই তাড়নায় তিনি অনেক সময় সুরমার শান্তভাবে কপটতা—মিষ্ট কথায় পরিহাস—আদরে উপেক্ষা অনু-ভব করিয়াছেন। এখন তাহা স্মরণ করিয়া ভীষণ যাতনা অনুভব করিতে লাগিলেন। দারুণ মর্ম্মপীড়ায় তাঁহাকে অধীর করিয়া তুলিল। তিনি একএকবার শরতের গলা জড়াইয়া ধরিতেছেন, আর বলি-তেছেন "সুরমার যদি আর চেতনা না হয়, তবে আমার এসকল যন্ত্রণার কথা কাহাকে বলিব—এসকল কথা সে না শুনিলে যে আমার হৃদয় জুড়াইবে না—রাবণের চিতাগ্নির ন্যায় এ হৃদয়ের যাতনার আগুন যে চিরদিন জ্বলিবে—কখন যে নির্ব্বাণ হইবে না। তাহার প্রতি অত্যাচার করিয়াছি—তাহাকে অসুখী করিয়াছি—

তাহার প্রাণে অপ্রেমের গরল ঢালিয়াছি—এখন তাহাকে যত্ন করিতে, তাহাকে ভালবাসিতে, তাহাকে আদর করিতে—তাহাকে সুখী করিতে না পাইলে যে আমার এ গুরুপাপের প্রায়শ্চিত্ত হইবে না। "শরৎ! বলনা আমার কি হবে!" এই বলিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে পাগলের ন্যায় সুরমার চেতনা সম্পাদনের জন্য ডাকিতে আরম্ভ করেন, শরৎ অতি ধীর ভাবে তাঁহাকে, রোগীকে বিরক্ত করা হইতে নিবৃত্ত হইতে—শান্ত হইতে—স্থিরভাবে সুসময়ের জন্য অপেক্ষা করিতে পরামর্শ দিতে লাগিলেন। এইরূপ যন্ত্রণা ভোগ করিতে করিতে সীতানাথের সে বিষাদময় রাত্রি অতীত হইল। শরৎ অবিশ্রান্ত রোগীর শুশ্রূষাতে নিযুক্ত। ডাক্তার ডাকিতে বিলম্ব করা কোন মতে বিধেয় নহে বুঝিয়া শরৎ প্রাতে ডাক্তার ডাকিয়া আনিলেন। তাঁহাকে বলিলেন, তিনি নিজে সহসা একটা গুরুতর ভয়ের কথা উপস্থিত করায় সীতানাথের স্ত্রী ভীত হইয়া সিহরিয়া উঠিলেন এবং তৎক্ষণাৎ ছিন্নমূল তরুর ন্যায় পতিত হইলেন। তারপর আর চেতনা হয় নাই কেবল সময় সময় এক এক-বার চক্ষু মেলিয়াছেন তাও অল্প ক্ষণের জন্য। এইরূপে সমস্ত রাত্রি কাটিয়াছে, এক্ষণে কি করা যায় বলুন? ডাক্তার বাবু ঔষধাদি ব্যবস্থা করিয়া দিয়া বলিলেন,ইহাঁকে আপাততঃ ইহাঁর পিতামাতা বা তত্তুল্য কোন আত্মীয় স্বজনের নিকট রাখিতে পারিলেই ভাল হয়। তাঁহাদিগকে সংবাদ দিয়া এখানে আনিতে পারিলেই ভাল, একান্ত পক্ষে ইহাঁকে তাঁহাদের নিকটে লইয়া যাওয়া আবশ্যক। শরৎ ডাক্তারবাবুর সহিত পরামর্শ করিয়া বুঝিলেন যে রোগ কঠিন হইয়াছে, দু এক দিনের মধ্যে চেতনা হইতে পারে, কিন্তু কোন একটা কঠিন পীড়ার সম্ভাবনা আছে, বিশেষ ভাবে উন্মাদ রোগের আশঙ্কা প্রবল। এরূপ অবস্থায় পিতা মাতার নিকটে থাকাই নিতান্ত প্রার্থনীয়। শরৎ বলিলেন ইহাঁর মা অনেক দিন

হইল মারা গিয়াছেন, সুতরাং সেখানে কি সুবিধা হইবে? ডাক্তারবাবু বলিলেন, না, মা যখন নাই, তখন সেখানে বিমাতা বা পিতার নিকট ইহাঁর আরোগ্যের সম্ভাবনা অল্প; কিন্তু এখানে কোন মতেই সুবিধা হইবে না, কারণ সর্ব্বদা যত্ন করিবার ও স্নেহ মমতাসহকারে সেবা করিবার উপযুক্ত একটী লোকও এখানে নাই। সীতানাথবাবুর সহিত পরামর্শ করিয়া দেখুন, কি করিলে ভাল হয়, এই বলিয়া ডাক্তারবাবু চলিয়া গেলেন।

সীতানাথ ও শরৎ দুজনে পরামর্শ করিয়া সুরমাকে শরতের বাড়ীতেই লইয়া যাওয়া স্থির করিলেন। স্থির হইবা মাত্র সীতানাথ ম্যাজিষ্ট্রেটের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া আপাততঃ এক সপ্তাহের বিদায় লইয়া আসিলেন। যাওয়ার সমস্ত আয়োজন হইতে লাগিল। সীতানাথ সুরমার নিকট বসিয়া রহিলেন, শরৎ সমস্ত আয়োজন করিতে লাগিলেন। আহারাদি করিয়া সকলে সত্বর ষ্টেসনে আসিয়া পোঁছিলেন। শরৎ অনেক পূর্ব্বে আসিয়া মধ্য-শ্রেণীর গাড়ীর একটা অংশ পূরা ভাড়া লইবার অভিপ্রায় জানা-ইলে, ষ্টেসন-মাষ্টার যথেষ্ট সময় নাই বলিয়া একবার ইতস্ততঃ করিতেছিলেন, শেষে ম্যাজিষ্ট্রেটের হেড ক্লার্কের পরিবার যাইবেন শুনিয়া আর মুহূর্ত্তকাল বিলম্ব না করিয়া আবেদন গ্রাহ্য করিলেন এবং নিম্নস্থ কর্ম্মচারীদের বলিয়া দিলেন যেন কোন অসুবিধা না হয়। শরৎ ইহাতে কিছুই আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন না, কারণ তিনি জানি-তেন যে, এ সকল স্থানে সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি ও লক্ষপতি জমীদার অপেক্ষা বড় লাট সাহেবের আড়দালী ও খানসামার সম্মান বেশী।

গাড়ী ষ্টেসনে পোঁছিবামাত্র একটী ইন্‌টারমিডিএট কামরা খালি করিয়া দেওয়া হইল। শরৎ সমস্ত দ্রব্যাদি তাহাতে তুলিলেন। সুরমার পাল্কীখানি গাড়ীর দরজার নিকট আসিলে পর শরতের সাহায্যে সীতানাথ সুরমাকে ধরিয়া গাড়ীতে তুলিলেন।

তিন চারিখানি তক্তা বিছাইয়া তাহার উপর বেশ প্রশস্ত শয্যা প্রস্তুত করিয়াছেন। সুরমাকে তাহাতে শয়ন করাইয়া দুইজনে নিকটে বসিলেন। গাড়ীর দুই দিককার দ্বারবন্ধ করিয়া তাহার উপর এক একখানি রিজার্ভ টিকিট বসাইয়া দিল। বাষ্পীয় রথ যথাসময়ে বর্দ্ধমান ষ্টেসন ছাড়িয়া কলিকাতাভিমুখে যাত্রা করিল।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

প্রেমমালার পদার্পণে।

আজ মনোরমার গৃহে দেবী-স্বভাবা প্রেমমালার শুভ পদার্পণ হইয়াছে—আজ তাঁহার শুভাগমনে মনোরমার গৃহে বেণিতীর্থে গঙ্গা ও যমুনার মিলনের ন্যায়, সুখ ও দুঃখের দুইটী ধারা—শান্তি ও ক্ষোভের দুইটী রেখা—আনন্দ ও সন্তাপের দুটী কণা পরস্পর পরস্পরকে আলিঙ্গন করিল। আজ বহুকাল পরে বধূদর্শনে মনোরমার মায়ের ভস্মাচ্ছাদিত শোক-বহ্নি প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। প্রেমমালার সেই পুরাতন বধূভাব—সেই সলজ্জ মিষ্ট সম্ভাষণ, সেই আনত মুখের কোমল দৃষ্টি, বৃদ্ধার প্রাণের পুরাতন স্মৃতিকে পূর্ণরূপে জাগাইল। বহুকালব্যাপী শান্তির অবসানে আগ্নেয় গহ্বরের অগ্ন্যুৎপাতের ন্যায়—ঘন ঘন ভূকম্পনে শান্ত-সলিলা সরসীর আলোড়নের ন্যায়—সেই তরঙ্গের ঘাত প্রতিঘাতের ন্যায়, আজ বৃদ্ধার হৃদয় তরঙ্গায়িত হইল—অনেক দুঃখের কথা বিনাইয়া বিনাইয়া কাতর কণ্ঠে তিনি রোদন করিতে লাগিলেন—গভীর শোকাগ্নি ক্ষণকালের জন্য গৃহের চারিদিক সন্তপ্ত করিয়া তুলিল। অশ্রু-জলে সকলের হৃদয় প্লাবিত হইল। সকলের দীর্ঘনিশ্বাসে গৃহ উত্তপ্ত হইল। প্রেমমালা অনেকক্ষণ ধরিয়া কন্যার ন্যায় বৃদ্ধার

নিকটে বসিয়া নীরবে অশ্রুবর্ষণ করিলেন। শোকাবেগ কিয়ৎ পরিমাণে প্রশমিত হইলে পর তিনি নানা প্রকার প্রিয়-বাক্যে সংসারের অসারতা ও বিধাতার কৃপার কথা বলিয়া শ্বাশুড়ীকে বুঝাইতে লাগিলেন। বৃদ্ধা ক্ষণকাল পরে সংসারের দুঃখ কষ্ট বিস্মৃত হইয়া কন্যা ও বধূসহবাসে আরাম ও শান্তি অনুভব করিতে লাগিলেন। তাঁহার বোধ হইল যেন স্বর্গ হইতে কোন দেবকন্যা তাঁহার সন্তপ্ত হৃদয়ে শান্তিবিধান করিতে আসিয়াছেন।

আজ মনোরমার গৃহ অপূর্ব্ব শ্রী ধারণ করিয়াছে। বিকসিত কুমুদদলজালে শরতের পূর্ণচন্দ্র পূর্ণরূপে প্রতিভাত হইলে সরোবরের যে অনুপম শোভা হয়—আজ সন্ন্যাসিনী প্রেমমালার পদার্পণে মনোরমার গৃহও তদ্রূপ অতুল শোভার আধার হইয়াছে। প্রেমমালার কমনীয় কান্তি ও প্রসন্নতাপূর্ণ মুখচ্ছবিতে আত্মসংযমের দৃঢ়তা ও লোকসেবার গুরুভারজনিত পূর্ণ গাম্ভীর্য্য বিকাশ পাইয়াছে—গতিশীল সংসারের ঘটনাস্রোতের প্রত্যেক তরঙ্গ তাঁহার ললাটফলকে যে চিন্তাকণাসকল রাখিয়া গিয়াছে, পুণ্য ও পবিত্রতার ঐ প্রসন্ন-সলিলা ক্ষুদ্র তটিনীর যে সকল প্রেম-বারিকণা সম্ভোগ করিয়া কত লোক আপনাকে কৃতার্থ ও ধন্য মনে করিয়াছে, যে শক্তির গুণে তিনি তাঁহার স্নেহপ্রাণ জনকজননীর শোকসন্তপ্ত প্রাণের দারুণ অন্তর্দাহ দূর করিয়া তাঁহাদিগকে আপনার অনুষ্ঠিত ব্রত পালনের সহায় করিয়া তুলিয়াছেন, তাঁহার যে সদনুষ্ঠানের সুমন্দহিল্লোল মৃদুমন্দ প্রবাহিত হইয়া দিক সকলকে প্রসন্ন করিয়াছে—শরৎচন্দ্র ও মনোরমা প্রেম-মালার পিতার নিকট আজ তাহা বিস্তারিতরূপে শ্রবণ করিয়া—আজ তাহা বিশিষ্টরূপে চিন্তা করিয়া—আজ তাহা গভীরভাবে অনুধ্যান করিয়া, চরিতার্থ হইলেন। আজ তাঁহা-দের বোধ হইল যেন, তাঁহাদের সংসার-ধর্ম্মের দীক্ষাগুরু তাঁহা-

দের গৃহে পদার্পণ করিয়া তাঁহাদিগকে কৃতার্থ করিয়াছেন। তাঁহারা সংসারধর্ম্ম-বন্ধনে বদ্ধ হইবার সময়ে যে সকল সাধু চিন্তার অনঙ্কুরিত বীজগুলি প্রাণে লাভ করিয়াছিলেন এবং এতদিন যে সকল বীজে সযত্নে জলসেচন করিতেছেন—তাহাদিগকে বিশিষ্টরূপে অঙ্কুরিত ও ফলবতী করিবার শুভ মুহূর্ত্ত উপস্থিত হইয়াছে দেখিয়া,আজ তাঁহারা প্রীতিপূর্ণ হৃদয়ে প্রেমমালার নিকটে বসিয়া একএকটী করিয়া প্রশ্ন করিতেছেন। প্রেমমালা নিষ্ঠাবতী ও ধর্ম্মপরায়ণা ঋষিপত্নীর ন্যায় উপদেশপূর্ণ প্রত্যুত্তর দানে তাঁহাদের হৃদয়ের আনন্দধারাকে খরতর করিয়া দিতেছেন।

শরৎচন্দ্র ও মনোরমা পরিজন পরিবেষ্টিত হইয়া প্রেমমালার নিকটে বসিয়াছেন। প্রেমমালা সকলকেই চিনিতেন, কেবল একটী অপরিচিতা বধূ অর্দ্ধাবগুণ্ঠনে অনতিদূরে উপবিষ্ট হইয়া তাঁহাদের পারিবারিক আনন্দ-স্রোতের মধুর গতি পর্য্যবেক্ষণ করিয়া সকলের অজ্ঞাতসারে ম্লান হইতে ছিলেন। তাঁহার মনে হইতেছিল "ইহারা এতগুলি লোক পরস্পরে মিলিত হইয়া পরম সুখে সংসারে দিনযাপন করিতেছে, শান্তি এবং সুখকে আপনা-দের চিরসহচর করিয়া রাখিয়াছে,আর আমি হতভাগিনী, আমার নিজের গৃহে নিজের স্বামীকে লইয়া সুখ শান্তিতে দিন কাটাইতে পারি না—আমি কি করিলে সুখে ঘর করিতে পারি, বুঝি না। আমাকে আমার দোষ দেখাইয়া দেয়—আমাকে সুপরামর্শ দিয়া সৎপথ দেখাইয়া দেয়—আমাকে স্নেহের সঙ্গে কর্ত্তব্যের পথে লইয়া যায়, এমন একটী লোকও নাই। এত দিন ত এদের বাড়ীতে আসিয়াছি—কই মনোর সঙ্গে ঠাকুরপোর ত এক দিনও কলহ, কি কথান্তর, কি মনকসাকসি দেখিলাম না—ইহারা বেশ সর্ব্বদা মনের আনন্দে কালযাপন করিতেছে। ইহারা পারে, আর আমরাই বা কেন পারি না? মনোরমা

ত সকল কথাই জানিয়াছে—তাহাকেই জিজ্ঞাসা করিব, কি করিলে আমি তার মত হ'তে পারি।" প্রেমমালা ঐ অপরিচিতা বধূর বিষয় জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলেন যে তিনি শরৎ বাবুর মাসতুতো ভাই সীতানাথ রায়ের স্ত্রী, নাম সুরমা। পরিচয়ের সঙ্গে সঙ্গে সুরমা একটু জড়সড় হইয়া বসিলেন। প্রেমমালাকে বলা হইল সুরমা কিছু কাল ধরিয়া রোগ ভোগ করিয়াছেন—এখনও সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য হন নাই। চিকিৎসা চলিতেছে। তবে আর কোন আশঙ্কা নাই। সীতানাথ প্রতি শনিবার আসিয়া থাকেন। কবিরাজী চিকিৎসা চলিতেছে—প্রতি রবিবারে কবিরাজ আসিয়া নূতন ঔষধাদির ব্যবস্থা করিয়া থাকেন।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

বালকে বালকে।

শরৎচন্দ্র এক দিন প্রাতে ভ্রমণান্তে গৃহে আসিলেন। সঙ্গে একটী বালক ও একটী বালিকা। দেখিলেই বোধ হয় ইহারা ভাই বো'ন। মনোরমা ইহাদিগকে দেখিবা মাত্র অশ্রুপূর্ণ নয়নে তাহাদিগকে ক্রোড়ে লইয়া ঘন ঘন মুখচুম্বন করিতে লাগিলেন। তিনি তাহাদের আকার ইঙ্গিতে বুঝিতে পারিলেন, যে অনাথ বালক বালিকার বিষয় তিনি তাঁহার মায়ের মুখে শুনিয়াছিলেন এবং যাহাদের তত্ত্ব লইতে শরৎচন্দ্রকে অনুরোধ করিয়াছিলেন, ইহারা সেই বালক বালিকা। এই দুটীর মা বাপ নাই শুনিয়া অবিনাশ ও বসন্তকুমার দুঃখিত হইল। তাহাদের হাত ধরিয়া নিজেদের ঘরে লইয়া গেল—কত ছবি, কত পুতুল আনিয়া তাহা-দিগকে দিল। অপরিচিত স্থানে দরিদ্র বালক বালিকা মনের দ্বার উদ্ঘাটন করিয়া সরলভাবে কথা কহিতেছে না দেখিয়া,

বসন্তকুমার ব্যস্ত হইয়া পড়িল—তাহাদিগকে হাসাইবার জন্য তাহাদিগকে খুসি করিবার জন্য—তাহাদিগের মনে একটু অসঙ্কোচ ভাবের সঞ্চার করিবার জন্য বিধিমতে চেষ্টা করিতে লাগিল। মনোরমা, অবিনাশ ও বসন্তকুমারের এই নবাগত অতিথিদ্বয়ের প্রীতিবর্দ্ধনার্থে বিবিধ আয়োজন দেখিয়া অত্যন্ত প্রীত হইলেন এবং স্নেহবিগলিত হৃদয়ে বার বার বালকদ্বয়কে চুম্বন দিতে লাগিলেন। বালকদ্বয়ের সদ্ভাবের বিকাশ হইতেছে দেখিয়া তিনি আনন্দবিস্ফারিত নেত্রে খোকার মাকে বলিলেন—দিদি, আজ অবিনাশ ও বসন্তকুমার দুজনে মিলিয়া ঐ দুটী ছেলে মেয়েকে যে যত্ন করিতেছে—তাহাদের মনের সঙ্কোচভাব দূর করিতে—তাহাদিগকে একটু হাসাইতে যে চেষ্টা করিতেছে, একবার আসিয়া দেখুন—দেখিলে চক্ষু জুড়াইয়া যাইবে। খোকার মা দৌড়িয়া গিয়া দেখিলেন বাস্তবিকই দুই ভাইয়ে মিলিত হইয়া নবাগত বালক বালিকাকে অতিমাত্র যত্নসহকারে গৃহের দ্রব্যাদি, বিশেষতঃ তাহাদের নিজেদের ক্রীড়ার দ্রব্য সকল দেখাইতেছে এবং দুজনে মিলিয়া তাহাদিগকে অনেক খেল্‌না ও পুতুল দিয়াছে। আর ইহাদের আদর ও ভালবাসার বিন্দু বিন্দু শিশিরে তাহাদের প্রাণ-পুষ্প মুকুলিত হইয়াছে—আর ক্ষণকাল পরে প্রস্ফুটিত হইলেও হইতে পারে।

দু এক দিন যাইতে না যাইতে অনাথ বালক বালিকা বুঝিতে পারিল তাহারা যে গৃহে আসিয়াছে সেখানে সকলেই তাহাদিগকে ভাল বাসিতে যেন প্রতিযোগিতা করিতেছে—কেহ কাহারও অপেক্ষা কম ভালবাসে, ইহা অনুভব করিবার অবসর আসে নাই। তাহারা অতি সাবধানে সকলের প্রিয় হইয়া চলিতে লাগিল। শরৎচন্দ্র মনোরমার সহিত পরামর্শ করিয়া শিশিরকুমারকে (বালক) বোর্ডিংএ রাখিয়া আসা স্থির করিলেন।

দেখিতে দেখিতে রবিবার আসিয়া উপস্থিত হইল। শরৎ বাবু শিশিরকুমারকে লইয়া বোর্ডিংএ যাইবার আয়োজন করিলেন। অবিনাশ ও বসন্ত বালকের গলা জড়াইয়া কাঁদিতে লাগিল দেখিয়া সরলা (বালিকা) অবাক হইয়া এক পার্শ্বে দাঁড়াইয়া চক্ষের জলে ভাসিতে লাগিল। শিশির সরলার দিকে তাকাইয়া বলিল—আমি যাই, তুমি বেশ সাবধানে, শান্তভাবে সকলের কথা শুনিয়া চলিবে, যেন কেহ তোমার কাজে বিরক্ত হন না। শরৎচন্দ্র শিশিরকে লইয়া যখন গাড়ীতে উঠিতেছেন, তখন অবিনাশ ও বসন্ত বলিল আমরাও তোমাদের সঙ্গে যাব, বোর্ডিং দেখে আস্‌বো। মনোরমা স্বামীকে বলিলেন—ইহাদিগকে লইয়া যাও। অনেক দিন হইল ইহারা কোথাও যায় নাই। তাঁহার উৎসাহ পাইয়া দুজনেই আনন্দে আটখানা হইয়া এক এক লম্ফ প্রদান করিল। চক্ষের পলকে দু ভাইয়ে কাপড় পরিয়া আসিয়া উপস্থিত হইল। শরৎচন্দ্র তাহাদের দুই জনকে সঙ্গে লইয়া গেলেন।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ।

আরোগ্য লাভে।

আজ সীতানাথ আসিয়াছেন। প্রায় দুই মাস অতীত হইল, সুরমা মনোরমার গৃহে আসিয়াছেন। তিনি, মনোরমা, তাঁহার মা ও অন্যান্য সকলের যত্ন ও শুশ্রূষাতে ও চিকিৎসার সুব্যবস্থাতে, ক্রমশঃ আরোগ্য লাভ করিতেছেন। সীতানাথ এবার আসিয়া দেখিলেন সুরমা প্রায় আরোগ্য হইয়াছেন—সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য হইতে আর অতি অল্প বাকি আছে। তাঁহার শরীর বেশ সবল হইয়াছে—স্মৃতিশক্তি বেশ ফিরিয়া আসিয়াছে। সকল বিষয়

বেশ বুঝিতে ও ভাবিতে পারেন—আর কোন খুঁত নাই—কেবল একএকবার অন্যমনস্ক হইয়া কি চিন্তা করেন। সন্ধ্যার পর সুরমা একাকিনী পুষ্পোদ্যানে উপবেশন পূর্ব্বক একাগ্র-চিত্তে কি চিন্তা করিতেছেন দেখিয়া সীতানাথ জিজ্ঞাসা করিলেন—সুরমা! তুমি কি ভাবিতেছ? একাকিনী নির্জ্জনে বসিয়া তোমার এখন কোন বিষয় চিন্তা করা ভাল নয়, তোমার শরীর এখনও সম্পূর্ণরূপে সুস্থ হয় নাই। সুরমা সহসা সীতানাথের কণ্ঠস্বর শুনিয়া চমকিত হইলেন সত্য, কিন্তু বিবাহের দিন হইতে এপর্য্যন্ত এমন মিষ্ট—এমন মধুমাখা প্রাণস্নিগ্ধকারী অমৃতকণা-ক্ষরিত সুস্বর আর কখনও শুনিয়াছেন বলিয়া মনে হয় না। সুরমার মনে হইল এই কি সেই লোক? না কোন দেবতা তাঁহার স্বামীর রূপ ধারণ করিয়া তাঁহাকে দরশন দিয়া—তাঁহার চিত্তচাঞ্চল্য—তাঁহার হৃদয়ের গভীর বিষাদ—অন্ত-রের দারুণ জ্বালা দূর করিতে আসিয়াছেন? ইচ্ছা হইল—নীরবে বসিয়া ঐ মধুময় ললিতস্বরে নিরন্তর শ্রবণ জুড়ান। বলিতে ইচ্ছা হইল—প্রাণাধিক—কি বলিলে—আবার বল—আমি তোমার সুমধুর প্রিয় সম্ভাষণে বিগলিত হইয়াছি—তুমি আবার বলিলে—আমি মূর্চ্ছা যাইব, কিন্তু মূর্চ্ছিত হইতে হইতে তুমি যে আসিয়া আমাকে ধরিবে—হতজ্ঞানে তোমার প্রেমক্রোড়ে শয়ন করিয়া যে সুখ হইবে, তাহাই আমার পরম লাভ—পরম সম্পদ—তাহাই আমার স্বর্গ! কিন্তু সুরমা ইহার একটী কথাও মুখ ফুটিয়া বলিতে পারিলেন না। ধীরে ধীরে অন্তরের ভাব অন্তরেই ডুবাইয়া দিলেন—প্রাণের গভীর নির্জ্জন স্থানে সে কথা লুকাইয়া রাখিলেন। ধীরে ধীরে সীতানাথকে নিকটে বসিতে বলিলেন। তিনি উপবেশন করিলে পর সুরমা বলিলেন "দেখ আজ তোমায় কিছু বলিব।" সীতানাথ বলিলেন 'বল'। সুরমা বলিলেন—

দেখ, আমি ইহঁাদের বাড়ীতে আসিয়া কেবল যে রোগমুক্ত হইলাম তাহা নহে—ইহঁারা আমার রোগের সময় যেরূপ যত্নসহকারে সেবা ও শুশ্রূষা করিয়াছেন, তাহাতে ইহঁারা আমাকে চিরদিনের মত কিনিয়া রাখিলেন। যেখানে যখন থাকি না কেন, নিকটে থাকি বা দূরে যাই, ইহঁাদের সদ্ভাব ও প্রেম শয়নে স্বপনে অন্তরে জাগিয়া থাকিবে। ইহঁাদিগকে আমার প্রাণের অতি নিকটে দেখিব। কখন ভুলিতে পারিব না। কিন্তু এই কথা বলিবার জন্য তোমায় বসিতে বলি নাই—ইহঁারা কি করিয়া পরম সুখে দিনযাপন করেন। আর আমরা দুজনে কেন মিলে মিশে সুখে সচ্ছন্দে দিন কাটাইতে পারি না? এই কথা জিজ্ঞাসা করিব বলিয়া তোমাকে বসিতে বলিয়াছি। তুমি কি এ সম্বন্ধে কখন কিছু ভাবিয়াছ? একটী দিন এক মুহূর্ত্তের জন্য ইহঁাদের বিচ্ছেদ নাই—একটীবারও কলহ কি অনাত্মীয়তা বা অসূয়া দেখিলাম না—যেন স্বর্গের ছবিগুলি প্রাণ পাইয়া এই বাগানে বিরাজ করিতেছে—দেখিলেই বোধ হয় যেন, বিধাতা ইহঁাদিগকে প্রীতির দেহে পবিত্রতার প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিয়া, শান্তি-জলে স্নান করাইয়া তঁাহার সন্তানদের সেবার জন্য ইহাদিগকে এখানে আনিয়া রাখিয়াছেন। আমরা কি ইহঁাদের মত সরল—অমায়িক—মিষ্টভাষী ও প্রেমপূর্ণ হইয়া আমাদের গৃহকে সুখের আলয় করিতে পারি না? আমার দৃঢ় বিশ্বাস, আমিই তোমার শান্ত স্বভাবকে চঞ্চল করিয়া তুলিয়াছি—আমিই তোমার সরল হৃদয়ের কোমল ভাব সকল কঠোর করিয়া দিয়াছি—আমিই তোমার ক্ষুদ্র গৃহকে অশান্তির অগ্নিকুণ্ডে পরিণত করিয়াছি—হায় আমার এমন কঠিন রোগ হইয়াছিল মরিলাম না কেন? কেন বিপুল অর্থ ব্যয় করিয়া আবার আমার চেতনা সম্পাদন করিলে? সীতানাথ সুরমার মুখে এই সকল আশার কথা শ্রবণ করিয়া আনন্দে বিহ্বল হইলেন এবং প্রেমভরে সুরমাকে বক্ষেঃ ধারণ করিয়া গাঢ়

আলিঙ্গনপাশে বদ্ধ করিয়া বলিলেন—প্রিয়তমে! আমারই মূর্খতা ও মূঢ়তা যে আমাদের পারিবারিক শান্তি ও সুখভোগের অন্তরায় হইয়াছিল, আমি তাহা বুঝিয়াছি—তোমার বালিকাস্বভাবসুলভ চপলতা ও সংসারের কাজে অমনোযোগিতা দর্শনে আমিই দিন দিন তোমার প্রতি অনুরাগবিহীন হইয়া পড়িতে ছিলাম—আমি বুঝিয়াছি—তোমার সরল ব্যবহারে কপটতা আরোপ করিয়া, তোমার প্রেমপূর্ণ মিষ্ট কথায় তীব্র হলাহলের জ্বালা অনুভব করিয়া, তোমাকে আরও দুরন্ত করিয়া তুলিয়াছি। তোমার সদ্ভাব ও শান্ত স্বভাব লাভে আমি একদিনও সাহায়তা করি নাই। এদোষ তোমার নহে, ইহার জন্য আমিই সম্পূর্ণরূপে দায়ী—আজ হইতে আমি তোমার সুখ ও শান্তি বৃদ্ধির জন্য, তোমাকে আমার সহ-চারিণী ও সহধর্ম্মিণী করিবার জন্য, জীবন উৎসর্গ করিলাম। তুমি কেবল দয়া করিয়া আমার পরামর্শ মত চলিলে আমি কৃতার্থ হইব। মনোরমা কেবল শরতের সুপরামর্শ ও সদুপদেশের অধীন হইয়া চলিয়া এত উন্নতি করিয়াছেন। তাঁহার উন্নত জীবন লাভে, তাঁহার গৃহকর্ম্মে শৃঙ্খলা—তাঁহার ধর্ম্মকর্ম্মে অনুরাগ—তাঁহার অতিথি অভ্যাগতের সেবা শুশ্রূষায় মনোযোগ প্রদর্শন করিতে শরৎচন্দ্রই পথপ্রদর্শক—শিক্ষক—তিনিই গুরুরূপে মনোরমার হৃদ-য়ের শ্রদ্ধা ভক্তির অধিকারী হইয়াছেন। মনোরমা শরৎচন্দ্রে স্বামী, সখা, শিক্ষক ও গুরু লাভ করিয়াছেন। আমি যদি শরৎ হইতাম, তুমি নিশ্চয়ই মনোরমার ন্যায় গুণসম্পন্না হইয়া নিজে সুখী হইতে এবং গৃহের সকলের, আত্মীয় স্বজনের এবং প্রতি-বেশীগণের চিত্তরঞ্জনে সক্ষম হইতে পারিতে—তোমার এই অনু-পযুক্ততার জন্য আমিই অপরাধী—রাজার দোষে যেমন রাজ্য নষ্ট হয়—স্বামীর দোষে সেইরূপ গৃহধর্ম্ম লোপ পায়—পরিবার উশৃঙ্খল হইয়া উঠে এবং শান্তি ও আরামস্থান গৃহ-প্রাঙ্গণ

অশান্তির উত্তপ্ত বালুকাপূর্ণ মরুভূমিতে পরিণত হয়—তাই আজ এই অপরাধ ভার নিজ মস্তকে গ্রহণ করিয়া তোমার নিকট বিনীতভাবে ক্ষমা চাহিতেছি। সুরমা বলিলেন—আমার অপরাধ যে কত তাহা আমি জানি—আমার অবিবেচনায় আমাদের মনের অসুখ ও অশান্তি বাড়িয়াছে, তাহাও আমি জানি—আর আমার অবাধ্যতা ও উগ্রভাবে যে তোমাকে কত অসুখী করিয়াছি তাহাও আমি জানি। আমার অপরাধের ডালি তোমার মাথায় চাপাইয়া দিয়া তোমাকে ক্ষমা করিব, একথায় আর আমার প্রাণ সায় দেয় না। আজ হইতে প্রতিজ্ঞা করিলাম, তোমার অনুগত হইয়া চলিব—তোমার ইচ্ছার অধীন হইতে—যদি আমার প্রাণপাত করিতে হয়—বিনাতর্কে—বিনা প্রতিবাদে তাহাও করিতে প্রতিশ্রুত হইলাম—তাহলেও কি আমি মনোরমার মত হইতে পারিব না? সীতানাথ আশাপূর্ণ হৃদয়ে দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন—আমি যদি শরৎচন্দ্র হইতে পারি, তুমি নিশ্চয়ই মনোরমা হইতে পারিবে।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ।

নূতন জ্ঞান লাভে।

কয়েক দিন হইল মনোরমা প্রেমমালার সহবাসে পরম সুখে দিন যাপন করিতেছেন। তাঁহাদের গৃহের কার্য্য কলাপের মধ্যে যেখানে যে একটু আধটু ত্রুটি, যে কাজে যে সামান্য বিশৃঙ্খলা আছে, প্রেমমালার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি হইতে সেগুলি অব্যাহতি পায় নাই—তিনি গোপনে মনোরমাকে তাহা বলিয়া দিলেন—মনো-রমা ইহাতে পরম প্রীতি অনুভব করিলেন, তাঁহার উপদেশ

ও পরামর্শ মত চলিবার অভিপ্রায় জানাইয়া কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিলেন। তিনি প্রেমমালার নিকট হৃদয়দ্বার উন্মুক্ত করিয়া জীবনের সকল কথাই বলিলেন। শরৎচন্দ্র কেমন ভাল বাসেন—তাঁহার যত্নে কত নূতন জ্ঞান লাভ করিবার সুবিধা পাইয়াছেন—পড়া শুনা বিষয়ে কত উন্নতি-লাভ করিয়াছেন, সাধারণ গৃহকর্ম্ম বিষয়েও তিনি শরৎচন্দ্রের নিকট অনেক শিক্ষা করিয়াছেন। প্রেমমালা মনোরমার পারিবারিক জীবনে এই সুখের অভিনয় দর্শন করিয়া অপার আনন্দ অনুভব করিলেন। সংসারে এমন এক সময় ছিল, যখন প্রেমমালা তাঁহাকে নিতান্ত শান্ত শিষ্ট ভালমানুষটীর মত দেখিয়াছেন—কিন্তু এখন সেই মনোরমা কর্ম্মপটু, জ্ঞাননিপুণ, দৃষ্টিকুশল ও ধর্ম্মপরায়ণা হইয়া উঠিয়াছেন। প্রেমমালা দেখিলেন, শরতের গৃহে মনোরমাই সুপ্রস্ফুটিত ও সুসৌরভপূর্ণ গোলাপ ফুল—আর বসন্তকুমার পুষ্পকোরকরূপে তাঁহার ক্রোড়ে বিরাজ করিতেছে। বিধাতা অন্যান্য সকলকে ইহাদের শোভা বৃদ্ধির জন্যই যেন এই ক্ষুদ্র উদ্যানে আনিয়া ফুটাইয়াছেন। সকলেই যথাশক্তি ফুটিয়াছেন—শোভা ও সৌন্দর্য্যপূর্ণ হইয়া সকলেই বিধাতার অভিপ্রায় সিদ্ধ করিতেছেন, কিন্তু মনোরমার স্ফুটনে বিধিলিপি যেন বিশেষভাবে প্রভাসম্পন্ন হইয়া উঠিয়াছে—তাঁহার গতিবিধি তাঁহার চলা ফেরা—তাঁহার প্রত্যেক নিঃশ্বাস-কণা পরমেশ্বরের করুণার পরিচয় দিতেছে। তিনিই সে ক্ষুদ্র সংসারের শক্তি সামর্থ্য, শোভা ও সৌন্দর্য্য, সদ্ভাব ও শান্তি। তিনিই সে উপবনে প্রসন্নসলিলা ক্ষুদ্র তটিনী—তাঁহার হৃদয়নিঃসৃত প্রেমকণাসকল মৃদুমন্দ প্রবাহিত হইয়া সকলকে স্নিগ্ধ ও মধুময় করিতেছে—তাঁহারই সুমিষ্ট মধুর সম্ভাষণে সকলে প্রীতমনে তাঁহার অনুগত হইয়া চলিতেছে—তাঁহারই ইঙ্গিতে চারিদিক সুশাসিত রহিয়াছে, তাঁহারই অঙ্গুলি

সঞ্চালনে সকল কর্ম্ম সুপ্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। তিনি নিত্যকর্ম্মে দৃঢ়ব্রত হইয়া সকলকে সুপথে পরিচালিত করিতেছেন। প্রেম-মালা এসকল দেখিয়া শুনিয়া পরম প্রীতি অনুভব করিলেন। তিনি পুলকে পূর্ণ হইয়া বার বার মনোরমাকে তাঁহার হৃদয়ের আনন্দ প্রকাশক প্রেমচুম্বন দিতে লাগিলেন।

প্রেমমালা আর থাকিতে পারেন না। মনোরমার গৃহ তাঁহার অতি প্রিয় স্থান হইলেও মনোরমাতে তাঁহার স্বামীর মূর্ত্তি, স্বামীর ভাব ভক্তি অতি কোমল আকারে বিরাজ করিতেছে; অনিমেষ নয়নে দিবা রাত্রি বসিয়া বসিয়া তাহা দেখিবার ইচ্ছা হইলেও, শান্তিপূর্ণ তপোবনসদৃশ গৃহে মনোরমাকে, তাঁহার পুত্র কন্যাকে, তাঁহার অনাথ বালক বালিকাদিগকে মনোরমার অন্যান্য আত্মীয় স্বজনকে সর্ব্বোপরি তাঁহার বৃদ্ধা শ্বশ্রূঠাকুরাণীকে রাখিয়া যাইতে ইচ্ছা না হইলেও, তিনি তাঁহার আরব্ধ কার্য্যের গুরুত্ব স্মরণ করিয়া, পাছে কর্ত্তব্য কার্য্যে অবহেলা হয়, এই ভয়ে নিজের তৃপ্তি ও আনন্দ সম্ভোগতৃষ্ণা খর্ব্ব করিয়া সত্বর পিত্রালয়ে যাত্রা করিলেন। কলিকাতায় আসিয়া যে নূতন জ্ঞান উপার্জ্জন করিয়াছেন, তাহা দ্বারা প্রতিবেশিনী বালিকা ও বয়স্কা বধূগণের জ্ঞানোন্নতির নূতন পন্থাসকল উদ্ভাবন করিতে পারিবেন, বিশেষভাবে ইহাই তাঁহার আনন্দের কারণ হইয়াছে। কলিকাতায় আসিয়া চিত্রশালা, পশু-শালা, কেল্লা, ইডেনগার্ডেন, বিশেষভাবে ইংলণ্ডীয় ভগ্নীদলের প্রতি-ষ্ঠিত অনাথআশ্রমে, পরিত্যক্ত নিরাশ্রয় বৃদ্ধ বৃদ্ধাদের সেবা শুশ্রূষায় আত্মবিসর্জ্জন, পাচক পাচিকা ও দাস দাসীর করণীয় সর্ব্ব প্রকার কাজে বিবিদিগের অনুরাগ এবং মুক্তিফৌজের কার্য্যকলাপ ও ত্যাগ স্বীকারের দৃষ্টান্ত সন্দর্শন করিয়া মোহিত হইয়াছেন। মনো-রমা ও শরৎচন্দ্র প্রেমমালা ও তাঁহার পিতাকে এই সকল স্থানে লইয়া গিয়া সমস্ত দেখাইয়াছেন। প্রেমমালা তাঁহাদের সাহায্যে

এই সকল নূতন তত্ত্ব সংগ্রহ করিয়া, নূতন জ্ঞান অর্জ্জন করিয়া, পিতার সহিত যাত্রা করিলেন। যাইবার দিন সকলের প্রাণে দারুণ ক্লেশের সঞ্চার হইল। বিনয়ভূষণের স্মৃতি আজ আবার সকলের প্রাণে জাগিয়া উঠিয়াছে, আজ আবার পুত্রশোকদগ্ধা বৃদ্ধা প্রেমমালাকে বক্ষে ধারণ করিয়া তাঁহাকে অশ্রুসিক্ত করিলেন। প্রেমমালা নতমস্তকে নীরবে অশ্রুবিসর্জ্জন করিয়া শ্বাশুড়ীর চরণ ধৌত করিতে লাগিলেন। আজ মনোরমার ও শরতের পুরাতন স্মৃতির উপরিস্থ কালের ধূলিকণাসকল সরিয়া পড়িয়াছে, তাঁহারা আজ বিষাদভরে অশ্রুবিসর্জ্জন করিতেছেন। তাঁহাদের সন্তানেরা বাড়ীর সকলকে কাঁদিতে দেখিয়া ভয়বিহ্বলচিত্তে তাঁহাদের নিকটে আসিয়া বসিয়াছে। বিন্দু বিন্দু শোক সমষ্টিভূত হইয়া সিন্ধুপ্রায় হইয়া উঠিল। সকলে সেই শোকসিন্ধুতে স্নান করিয়া ধীর এবং শান্তভাব ধারণ করিলে পর, প্রেমমালা পিতার সহিত সকলের নিকট বিদায় লইয়া শ্বাশুড়ীর চরণ বন্দনা করিয়া পিতৃগৃহে যাত্রা করিলেন।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ।

নিমন্ত্রণে।

সুরমার পীড়ার সময় বিমলানন্দ বাবু ও তাঁহার স্ত্রীর সহিত শরৎচন্দ্র ও তাঁহার পরিবারস্থ সকলের বিশেষ আত্মীয়তা জন্মিয়াছে। সুরমাকে দেখিবার জন্য বিমলাবাবু সর্ব্বদা সপরিবারে শরতের গৃহে আসিতেন। কখন কখন রাত্রিতে শরতের গৃহে থাকিতেন। সুরমার পীড়ার সময়ে স্নেহ মমতা ও সেবা শুশ্রূষার ব্যবস্থা দেখিয়া রমা (বিমলা বাবুর স্ত্রী) মনোরমার গৃহের সকলকেই আপ-

নার লোক—পরমাত্মীয় ভাবিতে আরম্ভ করিয়াছেন। সুরমার বর্দ্ধমান যাত্রার সময়ে, রমা ও বিমলা বাবু, শরতের গৃহে উপস্থিত ছিলেন, সুরমা মনোরমার গৃহের প্রত্যেক ব্যক্তির প্রতি, বিশেষ-ভাবে শরৎ ও মনোরমার প্রতি যে সপ্রেম কৃতজ্ঞতার ভাব প্রকাশ করিলেন, মনোরমাকে ত্যাগ করিয়া যাইতে যেরূপ ক্লেশ বোধ করিলেন, তাহাতে রমা মনোরমার প্রতি বিশেষ ভাবে আকৃষ্ট হইবেন ইহাই স্বাভাবিক।

ইহার অল্পদিন পরে, বিমলা বাবুর পুত্রের অন্নপ্রাশন উপলক্ষে শরৎ ও রামগোপাল বাবুর সপরিবারে নিমন্ত্রণ হইল। মনোরমা ও 'খোকার মা পুত্রকন্যাসহ রামগোপালবাবুর সহিত বিমলা বাবুর বাটীতে আসিয়াছেন। মনোরমা অনিচ্ছা সত্ত্বেও, জননীর পীড়াপীড়িতে ও খোকার মায়ের অনুরোধে একটু সম্পন্ন লোকের মত আসিয়াছেন। গৃহের অধিকাংশ লোক, এমন কি দাস দাসীরা পর্য্যন্ত তাঁহার প্রতি বিশেষ মনোযোগ প্রদর্শন করিতেছেন দেখিয়া, তিনি অত্যন্ত কুন্ঠিত ও দুঃখিত হইলেন। বিশেষতঃ আজ এখানে নিমন্ত্রণে আসিয়া মেয়েদের মধ্যে যাঁহাদের সহিত তাঁহার একটু কথা বার্ত্তা কহিতে ও আত্মীয়তা করিতে ইচ্ছা হইল, তাঁহারা অসঙ্কোচে তাঁহার সহিত মিশিতেছেন না দেখিয়া তিনি অত্যন্ত বিষাদিত হইলেন। আজ না বুঝিয়া নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধে এই কর্ম্ম করিয়া মনে মনে নিজেকেই তিরস্কার করিতে লাগিলেন। খোকারমাকে ডাকিয়া বলিলেন—দিদি, আপনার কথা শুনিয়া আজ আমাকে লজ্জায় পড়িতে হইতেছে। এই জন্যই লোক বলে, "পরের বুদ্ধিতে রাজা হওয়া অপেক্ষা নিজের বুদ্ধিতে ফকির হওয়া ভাল।" এমন কর্ম্ম আর কখনও করিব না। মনোরমা আজ জড়সড় হইয়া সকলের পশ্চাতে থাকিতেছেন। যতই আপ-নাকে গোপন করিতে যাইতেছেন, সুন্দরীর লাবণ্যভরা সৌন্দর্য্যের

কমনীয়তা ততই ফুটিয়া উঠিতেছে। সুমন্দ মারুতহিল্লোলে সাগর বক্ষঃ যেমন তরঙ্গ তুলিয়া নৃত্য করিতে থাকে, ছোট খাট গোছের একটুখানি সাজ সজ্জাতে মনোরমার দেহ-কান্তিও তেমনি উথলিয়া উঠিয়াছে। পূর্ণচন্দ্র শরতের হইলে যেমন অতুল শোভা ধারণ করে,প্রস্ফুটিত কুসুমদলরাজি বসন্তের ললিত হিল্লোলের স্পর্শ পাইলে যেমন প্রফুল্লভাব ধারণ করে, মনোরমার দেহলতাও সেই-রূপ বসনভূষণের সামান্য পারিপাট্যে রমণীয় শ্রী ধারণ করিয়াছে। তাঁহার সীমন্তের সিন্দুরকণা হইতে পাদভূষণ পর্য্যন্ত প্রত্যেক অঙ্গা-ভরণ তাঁহার দেহ মনের গৌরব ও শোভা বৃদ্ধির জন্য প্রতিযোগিতা করিতেছে। তিনি যতই নিজকে লোকচক্ষুর অন্তরালে রাখিতে যাইতেছেন, ততই সকলের নিকট ধরা পড়িতেছেন। শরৎ মনো-রমার অবস্থা দেখিয়া অবসরমতে দেখা পাইয়া বলিলেন—বেশ হয়েছে, "যেমন কর্ম্ম তেমনি ফল।" "অনভ্যাসের ফোটা কপাল চড় চড় করে।" তোমার এ নিগ্রহ কেন ? মনোরমা ক্ষণ-প্রভার বিন্দুসদৃশ হাসির কণাতে অধরওষ্ঠ মুকুলিত করিয়া সলজ্জ প্রীতিপূর্ণ দৃষ্টিতে শরতের হৃদয় জুড়াইয়া বলিলেন—আমি নাস্তানাবুদ্ হইতেছি দেখিয়া তোমার বুঝি খুব আনন্দ হইতেছে ? হউক, "ঘুঁটে পোড়ে, গোবর হাসে।" বড় বিপদ দেখিয়া, মনোরমা খোলোস ছাড়িলেন।

বিমলা বাবুর পুত্রের অন্নপ্রাশন উপলক্ষে তিনি দিনেরবেলা আত্মীয় স্বজন ও কুটুম্বগণকে নিমন্ত্রণ করিয়াছেন। আর রাত্রিতে বেশীরভাগ নানা শ্রেণীর পরিচিত বন্ধুবান্ধবগণকেও নিমন্ত্রণ করিয়া-ছেন। অধিকাংশ আত্মীয় স্বজন আহারান্তে বেলাবসানে চলিয়া গেলেন। সীতানাথ,শরৎচন্দ্র, রামগোপাল বাবু প্রভৃতি অনেকগুলি ঘনিষ্ট আত্মীয়-বন্ধু রাত্রিপর্য্যন্ত রহিলেন। তাঁহারা রাত্রিতে আহারের পর যাইবেন এইরূপ স্থির হইয়াছে। আজ সুরমা মনোরমার দর্শন

পাইয়া, তাঁহার সঙ্গে একটী দিন বাস করিতে পাইয়া, একবারে আনন্দে অধীর হইয়া পড়িয়াছেন। মনোরমার স্বভাব প্রকৃতি এমনই মধুর—এমনই মনমুগ্ধকর—এমনই হৃদয় স্নিগ্ধকর, যে যিনি তাঁহার সহিত মিশিতেছেন, আলাপ ও আত্মীয়তা করিতেছেন, প্রাণ দিয়া ভালবাসিতে যাইতেছেন, তিনিই মনোরমার ভাল-বাসা, মিষ্ট কথা ও সদ্ব্যবহারে আত্মবিক্রয় করিতেছেন। মনো-রমার একটু আরাম বৃদ্ধি করিতে পারিলে,প্রত্যেকেই যেন নিজেকে সুখী মনে করিতেছেন। কিন্তু তিনি রমার গৃহে আসিয়া অবধি ঠিক গৃহের একজনের মত হইয়া সকলের সমাদর ও সম্মান রক্ষার্থে নিয়ত নিযুক্ত রহিয়াছেন। কোন অপরিচিতারও কোন প্রকারে অভ্যর্থনার ত্রুটি না হয়, মনোরমা নিরন্তর সেই দিকে দৃষ্টি রাখি-য়াছেন। রমা নিজের ঘরে, সুরমা ভগ্নীর বাড়ীতে, যাহা করিতে পারিতেছেন না, মনোরমা আত্মীয়ের বাটীতে আসিয়া অসঙ্কোচে, অম্লানবদনে, ও অক্লান্ত দেহে তাহা সমাধা করিতেছেন দেখিয়া কতবার রমা আসিয়া সস্নেহ বাক্যে বলিতেছেন—তুমি না থাকিলে বো'ন্ আজ আমাদের যে কি দুর্দ্দশা হইত, তা আর বলিয়া শেষ করিবার নহে। আমি তোমার চেয়ে বয়সে বড়, কিন্তু তুমি আমার চেয়ে আর সকল বিষয়ে বড়। আজ অনেকেরই মুখে শুনিতে পাওয়া গেল, ঐ বউটী (মনোরমাকে লক্ষ্য করিয়া) দেখিতে যেমন সুন্দরী, কথাগুলিও তেমনি মিষ্ট, কর্ম্মকাজে খাটিতে খুটিতেও আবার সকলের চেয়ে বেশী পাকা। মেয়ে হ'বে ত ঐ রকম হওয়া চাই। দেখ্‌ছ না, এই অল্পক্ষণের মধ্যে সকলকেই কেমন বশ করিয়া ফেলিয়াছে। যাকে যা করিতে বলিতেছে সে অম্লানমুখে তাই করিতেছে। চক্ষের পলক পড়িতে না পড়িতে, ছায়াবাজীর পুতুলের মত—আকাশের বিদ্যু-তের মত, এই আছে, এই নাই, এখানে আছে, ওখানে নাই, অথচ

হিমালয় পর্ব্বতের উপর এক অতি উচ্চ শৃঙ্গের তলদেশে মেঘ সকল সমবেত হইয়াছে। মাঝে মাঝে সেই মেঘরাশির অভ্যন্তর হইতে চঞ্চলা চপলার বক্রদৃষ্টি নয়নগোচর হইতেছে—মেঘমালার এক প্রান্ত হইতে বৃষ্টি পড়িতে আরম্ভ হইয়াছে—মেঘের উপরি-ভাগের আকাশখণ্ড নির্ম্মল বলিয়া যে মেঘ বারিবর্ষণ আরম্ভ করিয়াছে, তাহারই উপর সূর্য্য কিরণসমূহ নিপতিত হইয়া অপূর্ব্ব ইন্দ্রধনুর সৃষ্টি করিয়াছে। স্ত্রীলোকেরা ও বালকবালিকাগণ এবং অন্যান্য সকলেই এক বাক্যে ছবিগুলির প্রশংসা করিতে লাগিলেন। বালকবালিকারা ছবিতে সমুদ্র, সমুদ্র-সলিলে বাড়-বানল, তরল অনল রাশির তরঙ্গমালা ও তদুপরি জাহাজের নৃত্য সেই সঙ্গে সঙ্গে পৃথিবীর গোলত্বের প্রমাণাদি ও তৎপরে পর্ব্বত, পর্ব্বত-দেহে মেঘমালার বিচরণ, বিদ্যুৎ ও বৃষ্টি, তদুপরি রৌদ্র ও রামধনু দেখিয়া মোহিত হইয়া গিয়াছে। তাহাদের সকলেই নীরব; এমন আগ্রহের সহিত সকলে সেই সিক্ত বস্ত্র খণ্ডের দিকে তাকা-ইয়া আছে যে একটী সুঁচ পড়িলে, তাহার শব্দ শুনিতে পাওয়া যায়। ছবি আসিতে বিলম্ব হইতেছে দেখিয়া বালকেরা একটু ব্যস্ত হইয়াছে, এই মাত্র কেবল তাহাদের এক আধটী ছোট ছোট কথা শুনিতে পাওয়া যাইতেছে। যোগানন্দ বাবু এইবার যে ছবি খানি আলোতে ধরিলেন, সেরূপ ছবি আর কেহ কখন ছায়াবাজীতে দেখায় নাই। ছবি খানি ধরিয়া বলিলেন, তিনি নিজে অনেক কষ্টে এইখানি এবং এইরূপ আরও দুএক-খানি প্রস্তুত করাইয়াছেন। ছবিখানির নীচে বড় বড় অক্ষরে লেখা আছে "গুহকালয়ে রাম" ছবি খানির মর্ম্ম সকলকে বুঝা-ইয়া দিয়া বালকগণকে সম্বোধন করিয়া যোগানন্দ বাবু বলিলেন— রামচন্দ্র রাজা হইয়া ক্ষুদ্রজাতি—ক্ষুদ্রব্যক্তি গুহকে চরণ হইতে তুলিয়া নিজের বক্ষে ধরিতে—আলিঙ্গন দিতে যাইতেছেন। রাজা

হইয়া রামচন্দ্র যদি চণ্ডালের প্রতি এমন সপ্রেম ব্যবহার করিতে পারিয়াছেন, তবে তোমরা, তোমাদের বন্ধুদের কাহাকেও ক্ষুদ্র বলিয়া, গরিব বলিয়া অথবা হীন জাতি বলিয়া, সামান্য লোক বলিয়া, ঘৃণা করিও না, বরং সর্ব্বদা স্নেহপূর্ণ মিষ্ট ব্যবহার দ্বারা সকলকে সুখী করিতে চেষ্টা করিবে। ভুলেও কখনও কাহারও প্রতি নিষ্ঠুর ব্যবহার করিবে না। আমি তোমাদিগকে আরও দুএকখানি ছবি দেখাইতেছি। তৎপরে আর একখানি ছবি দেখা দিল, তাহার এক পার্শ্বে চিতানল প্রজ্বলিত, এক ভিখারিণী একটী মৃতশিশু ক্রোড়ে লইয়া শিরে করাঘাত করিয়া রোদন করিতেছে, নিকটে ডোমবেশে রাজা হরিশ্চন্দ্র দণ্ডায়মান! ছবিখানি এত সুন্দর চিত্র করিয়াছে যে, বোধ হইল যেন জীবন্ত হরিশ্চন্দ্র শৈব্যাকে চিনিতে না পারিয়া বলিতে-ছেন "তুই কত কড়ি দিবি? অত কম কড়িতে আমার মনিবের কাজ করিতে পারিবনা।" রাজা হরিশ্চন্দ্রের দুর্দ্দশা—শৈব্যার পুত্রশোক ও ভিখারিণীর বেশে শশ্মান-পার্শ্বে মৃতপুত্র ক্রোড়ে লইয়া উপবিষ্ট দেখিয়া সকলেরই চক্ষে জলধারা প্রবাহিত হইল। এই সুযোগে যোগানন্দ বাবু হরিশ্চন্দ্রের প্রতিজ্ঞাপালন ও স্বার্থ-ত্যাগের কথা উল্লেখ করিয়া বালকগণকে বলিলেন—তোমরা দেখ, সত্যের পথে চলিতে গিয়া রাজা হরিশ্চন্দ্রকে রাজ্যপাট ত্যাগ করিয়া ভিখারীর বেশে দেশে দেশে ঘুরিতে ও শেষে শশ্মান-ঘাটে ডোমের কর্ম্মে নিযুক্ত হইতে হইয়াছে, কিন্ত তবুও বিশ্বাসী ভৃত্যের ন্যায় প্রভুর আদেশ পালন করিতে কুণ্ঠিত নহেন। যখন তিনি জানিতে পারিলেন, রাজমহিষী শৈব্যা তাঁহার মৃত পুত্র ক্রোড়ে লইয়া তাঁহার নিকট উপস্থিত, তখন শৈব্যার পার্শ্বে বসিয়া অজস্রধারে প্রবাহিত অশ্রুজলে বক্ষঃ প্লাবিত করিতে লাগিলেন।

বিংশ পরিচ্ছেদ।

ভাইবো'নে।

আজ শনিবার। বৈকালে শরৎচন্দ্র বোর্ডিংএর বালকদিগকে তাঁহার বাড়ীতে নিমন্ত্রণ করিয়াছেন। স্কুলের হেডমাষ্টার মহাশয়, সেই নিমন্ত্রিত ক্ষুদ্রদলের পরিচালকরূপে নিমন্ত্রিত হইয়া আসিয়াছেন। আজ শরৎ বাবুর বাটীতে বালকদল পূর্ণ স্বাধীনতা সহকারে মনের আনন্দে এদিক ওদিক বিচরণ করিতেছে। শিশির কুমার আজ সহোদরা সরলার সহিত অনেকক্ষণ ধরিয়া অনেক কথা কহিল। শিশির পূর্ব্বে আরও অনেকবার সরলাকে দেখিতে আসিয়াছে সত্য, কিন্তু পরস্পর মিলিত হইয়া নির্জ্জনে কথা কহিবার বেশী সুযোগ পায় নাই। আজ সে সুযোগ ঘটিয়াছে। সরলা আট বৎসরের বালিকা। সে আজ আড়াই বৎসর এবাটীতে পরমাসুখে আছে, সেকথা স্পষ্ট করিয়া বলিল, এত যত্ন ও মমতা সে নিজেদের বাড়ীতে কখন পাইত কি না, সে বিষয়েও সন্দেহ আছে। বাড়ীর সকলেই তাহাকে খুব ভাল বাসেন, কিন্তু অবিনাশের ভালবাসাই সকলের চেয়ে বেশী মূল্যবান। সরলা বলিল—কোন অন্যায় কাজ করিয়া, কোন দ্রব্য নষ্ট করিয়া, কি কিছু ভাঙ্গিয়া ধমক খাইয়া, কি সাজা পাইয়া একলা যদি কোথাও বসিয়া থাকি, আর কেহ আমার খোঁজ লইবার আগে, অবিনাশদাদা আমাকে খুঁজিয়া বেড়ায়, যদি দেখে আমার মুখ ভার হইয়া রহিয়াছে, নানা রকমে আমাকে হাসাইতে, কথা কওয়াইতে, খুসী করিতে চেষ্টা করে, আমার মুখ ভার থাকিলে, তার আর কিছুই ভাল লাগে না। তার অসুখ ও মনের কষ্টের ভয়ে আমাকে সর্ব্বদা হেসে খেলে বেড়াতে হয়, কিন্তু তাতে আমি

অপর সকলের একটু অপ্রিয় হইয়া পড়িতেছি। অন্যায় কাজ করিয়া, কোন দ্রব্য নষ্ট করিয়া, কিম্বা কিছু ভাঙ্গিয়া আমার খুব কষ্ট হয়, অত্যন্ত লজ্জা বোধ করি, আর এমন কাজ কখনও করিব না, খুব সাবধান হইয়া চলিব, মনে মনে এরূপ প্রতিজ্ঞাও করি। কিন্তু পোড়া অবিনাশ ও বসন্তের জ্বালায় আমার এক মূহুর্ত্তও শান্তভাবে বসিয়া থাকা চলে না।

ছেলেদের পক্ষে যে চঞ্চলতা শোভা পায়, মানাইয়া যায়, অনেক সময়ে ভাবী উন্নতির কারণ বলিয়া পরিগণিত হয়, মেয়েদের পক্ষে সেই চঞ্চলতাই নিন্দার বিষয় হইয়া থাকে। সরলা তাহা বেশ বুঝিতে পারে, কিন্তু ঠিক্ সেইমত চলিতে পারে না। অবিনাশ ও বসন্ত ছাড়া আর সকলেই তাহাকে চঞ্চলা, ও প্রগল্ভা বলিয়া মনে করিতেছেন এবং তাহাকে প্রতি পাদবিক্ষেপে সাবধান করিতেছেন, সে এক দিকে গুরুজনের শাসন, অন্য দিকে সঙ্গীদের ভালবাসাপূর্ণ তাড়না, এই উভয়ের মধ্যে পড়িয়া কি করিবে, অনেক সময়ে তাহা বুঝিতে পারে না। মোটের উপর অবিনাশের মনের অশান্তিকে সে বড় ভয় করে, সুতরাং অনেক সময়ে অবিনাশের তুষ্টি সাধন করিতে গিয়া নিজে তিরস্কৃত হয়। অবিনাশ জানে যে সরলা কোন প্রকার দোষ করিলেই নিজে,বড় কষ্ট পায়, তার লজ্জা হয়, সে জড়সড় হইয়া থাকে, তার উপর তাকে আবার তিরস্কার করিয়া কষ্ট দেওয়া অন্যায়, তাই সে অনেক সময়ে সরলার মনের শান্তি বিধানে ব্যস্ত হয়, সরলা দাদাকে বলিল—অবিনাশদাদা অনেক সময়ে আমার হ'য়ে বাড়ীর সকলের সঙ্গে ঝগড়া করে। শিশির এই সকল কথা শুনিয়া বেশী কিছু বলিল না,কেবল বলিল, মাকে ও জেঠাইমাকে বিরক্ত করিও না, কোন প্রকারে কষ্ট দিও না, তাঁহাদের স্নেহ মমতার উপর তোমার ও আমার ভবিষ্যৎ

নির্ভর করিতেছে, তাঁহারা বিরক্ত হইলে তোমার আমার দুজনেরই বিশেষ ক্ষতি হইবে।

এমন সময় বালকেরা সকলে বড় দালানে একত্র হইয়া খুব গোল করিতেছে, শিশির বলিল—সরলা, আমরা অনেক ক্ষণ দল ছাড়া হয়ে ব'সে আছি, সকলে কি ভাবিবে, চল শীঘ্র যাই, এই বলিয়া দুজনে উঠিল। এমন সময়ে বসন্ত ও অবিনাশ মনোরমার আদেশে ইহাদিগকে খুঁজিতে বাহির হইয়াছে তাহারাও খুঁজিতে খুঁজিতে সেইখানে আসিয়া উপস্থিত হইল। চারি জনে মিলিয়া কথা কহিতে কহিতে দালানে গিয়া উপস্থিত হইল। মনোরমা, সরলার সরল মুখ খানি অপ্রসন্ন হইয়াছে দেখিয়া, কিছু অশুভ গণনা করিলেন, কিন্তু স্নেহপূর্ণ মিষ্ট কথায় তাহার মুখখানি তুলিয়া ধরিলেন, সরলা মনোরমার আদরে মনের ভাব গোপন করিতে চেষ্টা করিল এবং ক্রমে বেশ প্রফুল্লভাবে সকলের সঙ্গে হেসে খেলে বেড়াইতে লাগিল। মনোরমার চক্ষু দুটী কিন্তু নিরন্তর সরলার উপর রহিল। সরলা এক অবিনাশের জন্য আপনার ক্ষতি করিতেছিল, এখন সে ভাবিতেছে আজ দাদা বলিল "আমার দোষে তাহারও ক্ষতি হইবে।" পোড়া আমি মরিলেইত সব গোল মিটে যায়। ক্ষুদ্র বালিকা এই গুরুতর চিন্তাভারে বিষণ্ণ হইতেছিল—তাহার প্রাণটা যেন ভাঙ্গিয়া যাই-তেছে, তবুও সে হেসে খেলে মনের ভাব গোপন করিতে চেষ্টা করিতেছে।

একবিংশ পরিচ্ছেদ

সুরমার পত্রে।

সুরমা মনোরমাকে সর্ব্বদা পত্রাদি লিখিয়া থাকেন। সর্ব্বদা তাঁহাদের সংবাদ পাইয়া থাকেন। কি শুভক্ষণেই পীড়িত হইয়া সুরমা মনোরমার গৃহে পদার্পণ করিয়াছিলেন! বৈশাখের প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ড-তাড়িত ব্যক্তির পক্ষে বটবৃক্ষের সুশীতল ছায়া যেমন, সুরমার পক্ষে মনোরমার গৃহও তদনুরূপ প্রীতিপ্রদ আরামস্থান হইয়াছে। তিনি তাঁহার পত্রাদিতে সর্ব্বদাই সে স্মৃতি জাগাইয়া রাখেন। আজ সন্ধ্যার সময়ে, মনোরমা সুরমার একখানি পত্র পাইলেন। পত্রখানি এই :—

স্নেহের বো'ন,

সংসারের কাজকর্ম্মের গোলমালে, কিছু দিন হইল, তোমাকে পত্র লিখি নাই। সকলে কেমন আছ, সর্ব্বদাই জানিতে ইচ্ছা হয়। খোকাকে লইয়া সর্ব্বদা বড় বিব্রত হইতে হয়। বেহারা বাহিরের কাজে, ঝি সংসারের কাজে সর্ব্বদাই ব্যস্ত থাকে। তবু সুলোচনা (কন্যা) একটু একটু সাহায্য করিতে শিখিয়াছে, তাই কখন কখন একটু লেখা পড়া করিতে, এক আধখানি চিঠি পত্র লিখিতে একটু অবসর পাই। এই তোমাকে পত্র লিখিতেছি, খোকা আসিয়া লেখনী ধারণ পূর্ব্বক আমার সুগঠিত বর্ণমালার দেহকান্তি বৃদ্ধি করিয়া দিতেছে। তুমি হয়ত ভাবিবে, আমি একাই চিত্র করিয়াছি, তাহা সত্য নহে, আমরা মায়ে পোয়ে এই লিপির অঙ্গসৌষ্টব বৃদ্ধি করিলাম। মেয়েটা আসিয়া ছেলেটাকে ধরিলে পর, নির্ব্বিঘ্নে শুভকর্ম্ম সুসম্পন্ন করিলাম। বয়সে প্রায় সমান হইলেও, সম্বন্ধে আমি তোমার বড়, সুতরাং আমি সেকালের লোক— প্রবীণা হইয়াছি, নবীনারা সর্ব্বদাই প্রবীণাদিগকে মূর্খ বলিয়া

তাচ্ছল্য করে, তোমার সহবৎ ভাল, তুমি ভাই সেরূপ কিছু মনে করিও না!

খোকার উপরের মাড়িতে দুটী দাঁত উঠিয়াছে, সে যখন আধ আধ মিষ্ট কথায় বা—বা—মা—মা বলিতে বলিতে হামা দিয়া আমার দিকে আসে, আর মুক্তাযুগলের ন্যায় ক্ষুদ্র দন্ত দুটী বাহির করিয়া হাসিতে হাসিতে আমার কোলে ঝাঁপ দেয়, তখন আমি আত্মহারা হইয়া সেই বিন্দুবৎ নির্ম্মল স্নেহকণার মধ্যে আপনাকে ডুবাইয়া দিই! আমি যে কি সুখে আছি তাহা পত্রে লিখিয়া বুঝাইতে পারিব না। একবার আসিয়া দেখিলে বুঝিতে পারিতে, আমি বিধাতার কৃপায় ও তোমাদের কল্যাণে স্বর্গ-সুখ সম্ভোগ করিতেছি। শিশুর আনন্দকোলাহলধ্বনি যখন তোমার বট্‌ঠাকুরের হৃদয় বিগলিত করে, তিনি যখন আমার পার্শ্বে দাঁড়াইয়া শিশুর সুমিষ্ট মধুর আহ্বানে মুগ্ধ হইয়া ঘন ঘন তাহার মুখচুম্বন করেন, আর সঙ্গে সঙ্গে শিশুবাহিকার প্রতিও করুণা করেন, তখন বুঝিতে পারি না, আমি স্বর্গে কি মর্ত্তে! যখনই এইরূপ সুখ ও শান্তির তরঙ্গ উঠিয়া আমাকে তাহাতে ডুবাইয়া দেয়, তখন ডুবে ডুবে বিধাতার দয়ার কথা—তোমাদের ভাল-বাসার কথা স্মরণ করিয়া আপনা আপনি এক অব্যক্ত মধুর ভাবে বিভোর হইয়া যাই।

খোকার ভাত শীঘ্র হইবে। ছয় মাসে হওয়ার প্রতিবন্ধক ছিল, তাই বিলম্ব হইয়াছে। এই উপলক্ষে তোমরা সকলে আমাদের বাড়ীতে আসিলে, আকাশের চাঁদ হাতে পাব। দুঃখের সময়ে—দুর্দ্দিনে এত করিয়াছিলে—সুখের সময়ে একবার আসিয়া দেখিবে না? দেখিবেই বা কেন? যে নিজের সুখে নিরন্তর বিভোর, তার কি আর অন্যের সুখ কল্পনা করিবার, কি কাহারও সংবাদ লইবার অবসর থাকে?

বিবাহের পর কয়েক বৎসর কাটিয়াছিল, তার পর তোমাদের বাড়ীতে গিয়াছিলাম। তোমাদের বাড়ীতে যাইবার পূর্ব্বের অবস্থা এখন স্মরণ হইলে হৃদয় কাঁপিয়া উঠে—ভয়ে গায়ে কাঁটা দেয়। সংসারে আমার মত কত হতভাগিনী ঐরূপ যম যন্ত্রণা ভোগ করিতে করিতে দিন কাটাইতেছে! তাহাদের অবস্থা স্মরণ করিয়া অন্তরে দারুণ বেদনা অনুভব করি—আমার চোখ দুটী জলে পূর্ণ হইয়া যায়।

আমার ভাগ্যে যে এত সুখ ছিল, তাহা স্বপ্নেও জানিতাম না। এত দুঃখের ভিতর পড়িয়া, এমন ক'রে মাটিতে মিশিয়া গিয়া, শেষে কোন্ পুণ্যবলে যে উঠিয়া দাঁড়াইলাম, বুঝিতে পারি না। বুঝিবই বা কেমন ক'রে—বিধাতার ব্যবস্থাই স্বতন্ত্র। আমরা যেখানে মৃত্যু কল্পনা করি, তিনি সেখানে জীবনের সঞ্চার করেন।

ঠাকুরপোর রঙ্গভঙ্গী দেখিতে—তাঁর কথা শুনিতে—তাঁর সঙ্গে খুটিনাটি করিয়া ঝগড়া বাধাইতে বড়ই ইচ্ছা হয়। এমনই লোক, যে ঝগড়া করিয়াও সুখ পাই। সংসারে তোমার মত ভাগ্যবতী অল্পই হয়। তোমার পারিবারিক জীবনের ছায়া পড়িয়াছে বলিয়া, আমরা আর সংসারের তীব্র তাড়নাতে সন্তপ্ত হই না।

আত্মীয় স্বজন, পুত্র কন্যাসহ তোমরা দীর্ঘ জীবন লাভ করিয়া সুখে সংসার কর, কায়মনোবাক্যে এই আশীর্ব্বাদ করি।

সকলে কেমন আছ শীঘ্র লিখিবে। তোমাদের সংবাদ পাই-বার জন্য পথ তাকাইয়া রহিলাম।

তোমার স্নেহের দিদি

সুরমা।

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ।

নূতন আমোদে।

শরৎচন্দ্র, রামগোপাল বাবু এবং বাড়ীর অন্যান্য সকলে আজ বালকগণকে লইয়া ব্যস্ত। মেয়েরা বালকদের আহারাদির ব্যবস্থা করিতে ব্যস্ত। বালকেরা তিন দলে বিভক্ত হইয়াছে। বাবুরা বালকদিগকে বিদ্যুতের আলো, চুম্বকের আকর্ষণশক্তি, তাড়িতের প্রবল পরাক্রম, বিজ্ঞানের অন্য নানাবিধ কৌশল এবং নানা দেশীয় চিত্র সকল দেখাইতেছেন। কতকগুলি বালক বিদ্যুতের আলো দেখিতে ব্যস্ত, অপর কয়েকজন টেলিফোঁ লইয়া পরস্পর কথা বলিতেছে, আর একদল একত্র হইয়া অ্যালবম্ ও অন্যান্য নানাপ্রকার ছবির বই লইয়া অতি সুন্দর সুন্দর ছবি দেখিতেছে। প্রথম দলে শরৎচন্দ্র, দ্বিতীয় দলে রামগোপাল বাবু এবং তৃতীয় দলে হেড্‌মাষ্টার মহাশয় নিজে বালকগণকে লইয়া সমস্ত দেখাইতেছেন ও বুঝাইয়া দিতেছেন। এইরূপে তিনটী ভিন্ন ভিন্ন বিভাগের প্রত্যেক বিষয় যখন সকল বালকের দেখা হইল, এবং তাহারা নানা প্রকার নূতন জ্ঞান লাভ করিয়া, নানা প্রকারের ক্রীড়া ও আমোদ সম্ভোগ করিয়া আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিল, তখন তাহাদের আহারের আয়োজন হইতে লাগিল। আহারের পর বালকেরা রাত্রিতে শরৎবাবুর বাটীতেই শয়ন করিল। পর দিন দল বাঁধিয়া কলিকাতা যাদুঘরে যাইবার কথা আছে। অগ্রে সংবাদ দিলে কর্ত্তৃপক্ষীয়দের কেহ কেহ উপস্থিত থাকিয়া বিদ্যা-লয়ের ছাত্রগণকে সমস্ত দেখাইয়া থাকেন। শরৎচন্দ্র সেখানকার কর্ত্তাদের সঙ্গে পূর্ব্ব হইতে সেইরূপ বন্দোবস্ত করিয়া রাখিয়াছেন। রবিবার বেলা বারটার সময় শ্যামবাজার হইতে ট্রামগাড়ীতে

উঠিয়া সকলে যাদুঘরে যাত্রা করিলেন। সঙ্গে হেড্‌মাষ্টার মহাশয়, রামগোপাল বাবু ও শরৎচন্দ্র।

যাদুঘরের দক্ষিণ অংশে যে নূতন বাড়ী প্রস্তুত হইয়াছে, তাহাতে নানা দেশীয় দ্রব্যজাত সংগ্রহ করিয়া বিহিত বিধানে সাজাইয়া রাখিয়াছে। ইহাকে আমাদের দেশীয় চিত্রাবলী, নানাবিধ শিল্পজাত ও পণ্যদ্রব্য সমূহের প্রদর্শনী বলিলেও বলা যাইতে পারে। শরৎ বাবু, রামগোপাল বাবু ও হেড্‌মাষ্টার মহাশয় বালকগণকে লইয়া যাদুঘরের এই অংশে প্রবেশ করিলেন।

নানা প্রকারের ছবি দেখিতে দেখিতে অল্প দূর অগ্রসর হইতে না হইতে একটী বালক বাম দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া মাষ্টার মহাশয়কে ডাকিয়া বলিল—দেখুন, কেমন সুন্দর সুন্দর ফল সাজাইয়া রাখিয়াছে—এই শীতকালে এরা পাকা কাঁঠাল, পাকা আঁব কোথায় পাইল? মাষ্টার মহাশয় একটু হাসিয়া বলিলেন, "তুমি খাবে?" বালক বলিল, "এরা দেবে কেন? আর দুই একটী আঁব কাঁঠালে আমাদের সকলের কুলাবে কেন?" এমন সময় বসন্তকুমার আসিয়া বলিল—না না, ও সকল আঁব, কাঁঠাল, নারিকেল, জাম, গোলাপজাম, লিচু, পেয়ারা প্রভৃতি গাছের ফল নয়, হাতে গড়িয়াছে। হাতে গড়া জিনিস কেমন সুন্দর হয়, তাই দেখাবার জন্য এখানে আনিয়া রাখিয়াছে। বালকেরা ইহার চারিদিকে ঘিরিয়া দাঁড়াইল—সকলেই দেখিবার জন্য ব্যস্ত হইল। এই সকল দ্রব্য দেখিবার উৎসাহ হ্রাস হইতে না হইতে কেহ কেহ নিকটস্থ বিবাহ বাটীতে গিয়া উপস্থিত হইল। বিবাহ বাটীর চিত্র দেখিয়া বালকদের অনেকেরই নিজেদের বাড়ীর চিত্র, মা বাপের কথা, ভাই বো'নের কথা মনে পড়িল। পল্লীগ্রামের মধ্যবিত্ত অবস্থার ভদ্র পরিবারের গৃহের আদর্শ। বালকদের একজন সকলকে ডাকিয়া বলিতেছে, দেখ দেখ, সদর বাড়ীতে বর

আসিয়াছে, ঐ দেখ মেয়েরা শাঁখ বাজাইতেছেন, এই বুঝি ক'নের বাপ, একটু অগ্রসর হইয়া সকলকে বসিতে বলিতেছেন। পুরুতঠাকুর একটা ডাবা হুকায় তামাক খাইতেছেন। ক'নেকে এক খানা পিঁড়িতে বসাইয়া সাত পাক দিবার জন্য লইয়া যাইতেছে, বা, বেশ্‌ত! আর একজন বলিল, বিয়ে-বাড়ী লোকে লোকারণ্য হইয়া গিয়াছে। দেখ দেখ, ঢুলী কেমন ঢোল বাজাইতেছে। আর একজন বলিল, দেখ দেখ, ঢুলীর একটা ছোট ছেলে কেমন কাঁসী বাজাইতেছে! অপর একটী বালক সকলকে ডাকিয়া বলিতেছে দেখ দেখ, এদের বাড়ীতে খোকা হয়েছে, খোকার মা একটুখানি ময়লা কাপড় পরিয়া আঁতুড় ঘরের বাহিরে বসিয়া বর দেখিতেছেন। আর একটী বালক শরৎবাবুর দিকে তাকাইয়া বলিল—দেখুন, এসব কারা গ'ড়েছে? সাহেব্‌রা? শরৎবাবু বলিলেন,—কৃষ্ণনগরের কুমারেরা এই সকল জিনিস গড়িয়া থাকে। বিবাহবাড়ী হইতে পূজা বাড়ীতে—পূজার আয়োজনে—লোকজনের নিমন্ত্রণে ও আহারা-দিতে বালকদের দৃষ্টি পড়িল। সেখানে লুচি, সন্দেশ, খাজা, গজা, দৈ, ক্ষীর খাওয়ার ঘটা দেখিয়া বালকদের চিত্ত নিতান্ত বিচলিত হইল। মাষ্টার মহাশয়ই লোভ সাম্‌লাইতে পারেন না, তা বালকদের আর অপরাধ কি? প্রথমেই সুপক্ক আঁব কাঁঠাল, পেয়ারা, আনারস প্রভৃতি দেখিয়া খাইবার ইচ্ছার উদ্রেক হইয়াছিল, তার পর আবার লুচির আয়োজন ও ব্রাহ্মণ-ভোজন দেখিয়া বালকদের চিত্ত চাঞ্চল্যের সম্পূর্ণ সম্ভাবনা। তাহাদের মধ্যে যাহারা ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের ছেলে, তাহাদের জিহ্বা রসাল হইয়া উঠিল। তৎপরে শ্মশান ঘাট—হিন্দুবধূর স্বামীর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া—বিলাপ ও অঙ্গাভরণ উন্মোচন করিতে দেখিয়া সকলেই বিষাদিত হইল। অনাথ বালকদের কাহারও কাহারও

পিতার মৃত্যুর কথা—জননী ও অন্যান্য আত্মীয় স্বজনের আর্ত্ত-নাদের কথা স্মরণ হইল—তাহাদের চক্ষে জল আসিল—মুখ বিবর্ণ ও বিষণ্ণ হইয়া গেল। তৎপরে উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলের পল্লীগ্রামের দৃশ্য—জমীদারের সদরবাটী, প্রজার নিকট হইতে খাজনা আদায় ও অন্যান্য নানা প্রকার কৌতূহল উদ্দীপক দৃশ্য দেখিতে দেখিতে বালকেরা এমন স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইল, যেখানে আর তাহাদের অগ্রসর হইতে সাহস হইতেছে না। তাহাদের বোধ হইল যেন নানা দেশীয় পাহাড়িয়া স্ত্রী পুরুষ একত্র হইয়া দাঁড়াইয়া অনিমেষ দৃষ্টিতে বালকদের দিকে তাকাইয়া আছে!

অবিনাশ অগ্রসর হইয়া বলিল—তোমরা ভয় পাইয়াছ? চল, আমি তোমাদিগকে লইয়া যাইতেছি। ওসকল জীয়ন্ত মানুষ নহে—ওসব বড় বড় পুতুল! প্রথমে কেহ বিশ্বাস করে নাই। শেষে অবিনাশ যখন অগ্রসর হইল, তখন সকলেরই সন্দেহ দূর হইল। এই সকল মনুষ্যমূর্ত্তির জীবন্ত ভাব দেখিয়া বালকেরা একবারে অবাক হইয়া গেল। নানা দেশীয় বাদ্যযন্ত্র, পরিধেয়,অস্ত্রশস্ত্র ও মনুষ্যমূর্ত্তিসকল দেখিতে দেখিতে ও তাহাদের সম্বন্ধে নানা প্রকার নূতন তত্ত্ব অবগত হইতে হইতে বালকেরা অগ্রসর হইতেছে। এইবার বালকেরা রেশমের কারখানায় আসিয়া উপস্থিত হইল। কারখানার এক প্রান্তে একটী স্ত্রীলোক ঘোমটা দিয়া বসিয়া গুটী হইতে রেশমের সূতা প্রস্তুত করিতেছে। স্ত্রীলোকটী এমন ভাবে বসিয়া কাজ করিতেছে, দেখিয়াই বোধ হইল যেন মুরশিদাবাদের কোন তাঁতীর বাড়ীর অন্দরমহল। বালকেরা এই সকল নূতন জ্ঞান লাভ করিয়া অপার আনন্দ অনু-ভব করিতে লাগিল।

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ।

বসন্তের জন্মদিনে।

আজ কাশীপুরের ক্ষুদ্রগৃহ আনন্দপূর্ণ হইয়াছে। বালকগণের আনন্দ কোলাহলে চারিদিক পূর্ণ হইয়া গিয়াছে—আজ বসন্তের জন্মদিন। আজ সে নয় বৎসর অতিক্রম করিয়া দশে পড়িল। অবিনাশ আজ বসন্তকে ও অন্যান্য বন্ধুদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়াছে। অবিনাশ বসন্তকে একটী অতি সুন্দর পরিচ্ছদ উপহার দিয়াছে, তাহাকে অনেক সুন্দর সুন্দর ছবি দিয়াছে, নানাপ্রকারে তাহার চিত্তরঞ্জনে—তাহার আনন্দ বর্দ্ধনে নিযুক্ত হইয়াছে। আজ বাড়ীর অন্য বালক বালিকারাও তাহাদের নিজ নিজ সঞ্চিত অর্থ হইতে কিছু কিছু ব্যয় করিয়া বসন্তকে কেহ একটা খেল্‌না, কেহ একখানি ছবি, কেহ একখানি ভাল বই, কেহ বা লিখিবার জন্য দোয়াত কলম ক্রয় করিয়া উপহার দিয়াছে।

মনোরমা বসন্তকুমারকে নিজের প্রকোষ্ঠে ডাকিয়া নিকটে বসাইয়া বলিলেন—বাবা, আজ তুমি দশ বৎসরে পড়িতেছ, তোমার আর পুতুলের মত কেবল খেলার জিনিস হ'য়ে থাকা ভাল দেখায় না। আজ ভাবিয়া দেখ, সম্বৎসরের মধ্যে তোমার কোথায় কি দোষ হইয়াছে, কেহ তোমার উপর কোন কারণে বিরক্ত আছেন কি না। যে সকল কাজ তুমি করিলে, আমরা খুব সুখী হইতাম—তাহা সমস্ত করিয়াছ কি না—সরলা, অবিনাশ, খুকি ও অন্যান্য সকলের প্রতি তুমি সর্ব্বদা সদয় ব্যবহার করিয়াছ কি না—ভাল করিয়া এ সকল ভাব। তোমার ভাই ও ভগ্নীদের কেহ যদি তোমার উপর বিরক্ত থাকে, তাহাকে, তোমার প্রতি সন্তুষ্ট হইতে, তোমাকে ক্ষমা করিতে, তোমাকে আশীর্ব্বাদ করিতে বল।

ছেলেদের প্রথম কুড়ি বৎসর বয়সই সুখের সময়—তোমার তাহার অর্দ্ধেক কাটিয়া যায়, সম্মুখে আর দশ বৎসর রহিল, ইহারই মধ্যে তোমাকে মানুষ হইতে হইবে। লেখা পড়া শিখিয়া, চরিত্রবান লোক হইয়া, পিতা, মাতা ও আত্মীয় স্বজনের মুখোজ্জ্বল করিতে যদি ইচ্ছা করিয়া থাক, তবে এই দশ বৎসরের মধ্যে তোমাকে তাহাতে কৃতকার্য্য হইতে হইবে। এখন যদি তোমার সে চিন্তার উদয় না হয়, তবে কোন দিন উন্নতি করিতে পারিবে না। আর এই দশ বৎসরের এক একটী দিন তোমার পক্ষে মহামূল্যবান্। প্রত্যেক দিনের প্রত্যেক মুহূর্ত্ত বিবেচনা করিয়া ব্যয় করা উচিত। হাসিবে, খেলিবে, নাচিবে, কিন্তু তোমার সেই আমোদ আহ্লাদের অন্তরালে তোমার ভাবী মনুষ্যত্ব ও নানাপ্রকার সদ্‌গুণের অঙ্কুর সকল নিহিত দেখিতে চাই। তোমার চরিত্র এবং আচরণের উপর আমাদের গৃহের ভবিষ্যৎ সুখ শান্তি নির্ভর করিতেছে, তুমি অমায়িক, সুশিক্ষিত, সরল ও সর্ব্বোপরি ঈশ্বরপরায়ণ লোক হইলে, আমাদের আরাম ও আনন্দের সীমা থাকিবে না, আর যদি তুমি অসাবধান ও উশৃঙ্খল হইয়া আমাদিগের সকলকে সে সুখের আশায় বঞ্চিত কর—তাহা হইলে তোমার ও আমাদের আর দুঃখ রাখিবার স্থান থাকিবে না—বাড়ী ঘর করিয়া—বন্ধু বান্ধব লইয়া—সুখে সচ্ছন্দে বাস করা বৃথা হইবে। শাস্ত্রে বলেঃ—

"একেনাপি সুবৃক্ষেণ পুষ্পিতেন সুগন্ধিনা।
বাসিতং তদ্বনং সর্ব্বং সুপুত্রেণ কুলং যথা॥"

সুগন্ধীপুষ্পযুক্ত বৃক্ষ যেমন সমগ্র বনভূমি আমোদিত করে, একমাত্র সুপুত্রের গুণ-গৌরবে সমস্ত পরিবারের মুখও সেই-রূপ উজ্জ্বল হয়।

তুমি সজ্জন হইলে, তোমার দ্বারা আমরা পরিচিত হইতে গৌরব মনে করিব, ইহার অন্যথা হইলে, আমাদের দুঃখ ও ক্ষোভের সীমা থাকিবে না।

তখন বসন্তকুমার সজল নয়নে মায়ের মুখের দিকে তাকাইয়া বলিল—আমি ত আমার সাধ্যমত লেখাপড়া করিতে ও তোমাদের কথা শুনিয়া চলিতে চেষ্টা করি। তবে আমি বড় চঞ্চল বলিয়া অনেক সময় দাদার সঙ্গে ঝগড়া করিয়া ফেলি। কিন্তু যখন নিজের দোষ বুঝিতে পারি, তখন ভয়ানক কষ্ট হয়। মনে মনে ভাবি কেন এমন করিলাম। আমার কোন কাজে তোমাদিগকে ক্লেশ পাইতে দেখিলে, আমার মনে বড় কষ্ট হয়—তখন আমার কিছু ভাল লাগে না। আর আমার একটা ভয়ানক দোষ এই যে, আমি দিদিমায়ের সঙ্গে বড় গোলযোগ করি—তাঁকে বড় কষ্ট দেই।

মনোরমা সন্তানকে আত্মদোষ স্বীকার করিতে দেখিয়া আনন্দবিগলিত হইয়া বসন্তের মুখখানি তুলিয়া ধরিয়া সেই অশ্রুসিক্ত মুখে শত শত চুম্বন দিয়া বলিলেন—বাবা, তবে তোমার দাদাকে আজ ডাকিয়া তাহার নিকট ক্ষমা চাও—তাহাকে বল যে অনেক সময়ে না বুঝিয়া তাহার প্রতি কত অন্যায় ব্যবহার করিয়াছ—আজ তাহাকে সে কথা বল, দেখিবে তোমার সহিত তাহার বন্ধুতা আরও বাড়িয়া যাইবে। জননীর স্নেহপূর্ণ মিষ্ট কথায় বসন্তের ক্ষুদ্র প্রাণ আজ একবারে গলিয়া গিয়াছে। সে আজ নিজেকে একবারে মায়ের হাতে ছাড়িয়া দিয়াছে।

অবিনাশ অনেকক্ষণ বসন্তকে দেখিতে না পাইয়া খুঁজিতে খুঁজিতে কাকীমায়ের ঘরে আসিয়া উপস্থিত হইল। বসন্ত দাদাকে দেখিয়া অমনি তাহার গলা জড়াইয়া ধরিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল—দাদা, আমি তোমার সঙ্গে অনেক ঝগড়া করিছি—তুমি আজ আমাকে এত খাওয়াইতেছ—কাপড় কিনিয়া দিয়াছ—

আরও কত ছবি দিয়াছ, আমি তোমার সঙ্গে এ সকলের উপ-যুক্ত ব্যবহার কিছুই করি নাই। আজ দয়া করিয়া আমাকে ক্ষমা কর। অবিনাশ আজ বসন্তের জন্য এই সকল আয়োজন করিতেছিল সত্য, কিন্তু বসন্ত সময়ে সময়ে তাহার সঙ্গে যে কলহ করিয়াছে, কর্কশ কথা কহিয়াছে, তাহা স্মরণ করিয়া সে মনে মনে ক্লেশ পাইতেছিল। তাহার ইচ্ছা হইতেছিল আজ বসন্তের সঙ্গে একটা খোলাখুলি কথা হয়, আত্মীয়তা ও ভালবাসা পূর্ব্বাপেক্ষা একটু বাড়িয়া যায়। বসন্তের ক্রন্দনে ও দুঃখ প্রকাশে অবিনাশের মনের গ্লানিটুকু অন্তর্হিত হইল। অবিনাশ বসন্তের এরূপ অকপট দুঃখ প্রকাশে প্রাণে একটু তৃপ্তি অনুভব করিয়া বলিল—ভাই, আমিও অনেক সময়ে না বুঝিয়া তোমায় অন্যায়রূপে তিরস্কার করিয়াছি, কত কষ্ট দিয়াছি, তুমিও আমাকে ক্ষমা কর।

বিশেষভাবে আজ অবিনাশ তাহার কাকীমায়ের ন্যায়বিচার ও নিষ্ঠার ভাব দেখিয়া তাঁহার প্রতি আরও অধিকতর শ্রদ্ধাবান হইয়া উঠিল।

বসন্তের জন্মদিন সার্থক হইল। তাহার সততা ও সুশিক্ষা লাভের পথ আজ আরও একটু প্রশস্ত হইল—সে আজ দিদিমার নিকট ও বাড়ীর অন্যান্য সকলের নিকট ক্ষমা চাহিয়া তাঁহাদের আশীর্ব্বাদ ভিক্ষা করিতেছে। আজ সে জীবনের উন্নতি পথে—সততা ও সদ্ভাবের পথে আর এক পা অগ্রসর হইল দেখিয়া শরৎচন্দ্র ও মনোরমা মঙ্গলময় বিধাতাকে স্মরণ করিয়া কৃতজ্ঞ হইলেন।

চতুর্ব্বিংশ পরিচ্ছেদ

লেখা পড়াতে।

এইরূপে সুখ ও সম্পদের ভিতর দিয়া জীবনের দিনগুলি, এক এক করিয়া কাটিতে লাগিল। বৎসর পরে বৎসর এইরূপে শান্তি ও সম্পদের মধ্য দিয়া চলিয়া যাইতেছে। রামগোপালবাবু ও শরৎ চন্দ্রের সংসারের আশা ভরসার ভাবী চিত্র পূর্ণরূপে প্রতিফলিত হইতেছে। অবিনাশ ও বসন্তকুমার অতিমাত্র আগ্রহ সহকারে নিজ নিজ ক্ষুদ্র জীবনের উন্নতি সাধনে নিযুক্ত রহিয়াছে। অবি-নাশ এবার প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া বৃত্তি পাইয়াছে। আজ তাহার পিতামাতার আনন্দে বাড়ীর অপর সকলেই আনন্দিত, সে বালকের সুখে সকলেই সুখী। অবিনাশ তাহার বহু কালের সঞ্চিত অর্থ হইতে কিছু ব্যয় করিয়া আজ বাড়ীর সকলকে ও অন্যান্য সমবয়স্কদিগকে খাওয়াইতেছে। আজ আহারের সময় বসন্ত,সরলা,বিশেষভাবে অবিনাশ নিজে পরিবেশনের ভার লইয়াছে। কাহার কি চাই, বালকেরাই দেখিতেছে। আহারের সময়ে নানা প্রকার কথা বার্ত্তা চলিতে চলিতে ক্রমে অবিনাশ ও বসন্তের কথা পড়িল,বসন্ত আগামী বৎসর পরীক্ষা দিবে—বসন্তকে সকলেই একবাক্যে বলিলেন—আবার আর বৎসর তোমাকেও এইরূপে আমাদিগকে খাওয়াইতে হইবে। যদি অবিনাশের মত স্কলারসিপ্ না পাও, তাহা হইলে তোমার পাস করা মঞ্জুর হইবে না। বসন্ত সলজ্জভাবে নত মস্তকে বলিল—আমি কি আর দাদার মত ভাল ছেলে হ'তে পারব? শেষে চুপে চুপে বলিল—আমি যদি

সকল বিষয়ে দাদার মত হ'তে পারি,আমার পরম সৌভাগ্য ব'লে মনে ক'র্‌ব।

কথায় কথায় অবিনাশের পড়া শুনার কথা উঠিল। সে এবার কোথায় পড়িবে, কোন্ বিষয়ে তাহার অধিক অনুরাগ—ভবিষ্যতে কিরূপ কাজে গেলে তাহার কল্যাণ হইবে এই সকল বিষয়ের কথা হইতে লাগিল। বিমলা বাবু ও তাঁহার কনিষ্ঠ যোগানন্দ বাবু, সীতানাথ বাবু এবং শরৎ ও রামগোপাল বাবুদের আফিসের কেহ কেহ নিমন্ত্রিত হইয়াছেন। বোর্ডিংএর কয়েকটী বালক এবং হেড্‌মাষ্টার মহাশয়ও আসিয়াছেন। আহারের আয়োজন ও পরিবেশনের সুব্যবস্থা দেখিয়া সকলেই অবিনাশ, বসন্ত ও সরলার শ্রমশীলতা ও কর্ম্মপটুতার প্রশংসা করিতে লাগিলেন। আহারান্তে রামগোপাল বাবু সকলকে বিদায় দিবার সময় অবিনাশ প্রভৃতি সকলকে ডাকিয়া বলিলেন—বাবুরা সকলেই বাড়ী যাইতেছেন, সকলকে সসম্মানে বিদায় দাও। কাহাকেও জল কি পান দিতে হবে কি না, তাহা জিজ্ঞাসা কর। তদনুসারে অবিনাশ ও বসন্ত সকলকেই এক একবার জিজ্ঞাসা করিল। সকলে বিদায় লইবার সময়, অবিনাশ ও বসন্ত সকলকে প্রণাম করিয়া বিদায় দিল। যাইবার সময় প্রত্যেকেই বালকদের ব্যবহারে অত্যধিক প্রীত ও পরিতৃপ্ত হইয়া গৃহে গমন করিলেন।

সকলকে বিদায় দিয়া অবিনাশ, বসন্ত ও সরলা বাড়ীর অন্যান্য মেয়েদের সঙ্গে খাইতে বসিল।

বাড়ীর কর্ত্তারা, মাষ্টার মহাশয় ও সীতানাথ বাবুকে লইয়া বাহিরের ঘরে বসিয়া বর্ত্তমান সময়ের নানা প্রকার সামাজিক প্রশ্নের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলেন।

পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ।

মা ও মেয়েতে।

মনোরমার সরলাকে একটু প্রয়োজন হইয়াছে, অনেকগুলি কাপড় ছিঁড়িয়াছে, দুজনে বসিয়া কাপড়গুলি মেরামত করিবেন বলিয়া আহারান্তে তাহাকে খুঁজিতেছেন। কোথাও না পাইয়া শেষে খিড়্কীর বাগানে গিয়া সরলা সরলা বলিয়া দুই তিন বার ডাকিতে ডাকিতে সরলা ছুটিয়া আসিল। তাহার আসার ভাবে বোধ হইল যেন সে কিছু বিশেষ কাজে ব্যস্ত ছিল। মনোরমা তাহাকে বলিলেন—এস দেখি, আজ একটু সেলাইএর কাজ আছে —দুজনে সেই কাজটুকু করিগে। দেখ্‌বো দুজনের মধ্যে কে বেশী সেলাই ক'র্‌তে পারে। তখন সরলার সে কাজ করিতে এক তিল ইচ্ছা না থাকিলেও অম্লানমুখে হাসিতে হাসিতে বলিল—মা, হাজার শীগ্‌গির সেলাই ক'র্‌তে পারিলেও আমি তোমার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে জিত্‌তে পার্‌বো না। আর তোমার সেলাই কেমন সুন্দর হয়। মনোরমা বলিলেন—তুমিও চেষ্টা করিলে হয়ত আমার চেয়ে ভাল ক'রে সেলাই ক'র্‌তে পার্‌বে।

স। হায়রে আমি আবার চেষ্টা ক'র্‌বো।

ম। কেন, তুমি কি চেষ্টা কর না? আর যখনই চেষ্টা কর, তখনই কি তোমার কাজ ভাল হয় না?

স। হ্যাঁ মা, আমি যখন চেষ্টা করি, তখন আমার কাজ খুব ভাল হয়—কিন্তু তাই বলিয়া তোমার মত হয় কি?

ম। আমার মত বড় হ'লে আমার মত হবে। তুমি এখন ছেলে মানুষ, ছেলে মানুষদের মধ্যে তোমার কাজ খুব ভাল হয়।

যত্ন করিলে তাহার কাজ বেশ সুন্দর হয়—তাহার বয়সের মেয়েদের সকলের অপেক্ষা তাহার কাজ, তাহার মায়ের খুব ভাল লাগে শুনিয়া সরলা আনন্দে ফুটিয়া উঠিয়াছে—উৎসাহে তাহার সুন্দর মুখখানি টুক্‌টুকে লাল হইয়া উঠিয়াছে—চক্ষুদুটী বড় হইয়াছে, সঙ্গে সঙ্গে চোখের পাতার কোলে জল দেখা দিয়াছে। মনোরমা একটীবার পশ্চাদ্দিকে তাকাইয়া দেখিলেন সরলা একবারে গলিয়া গিয়াছে। মনোরমা সরলাকে লইয়া কাজে বসিলেন। সুবিধা বুঝিয়া মনোরমা সরলাকে বলিলেন—সরলা, তোমাকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলে, পরিষ্কার উত্তর পাই না। আজ আমি তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করিতে চাই,তুমি যদি উত্তর দাও তাহ'লে আমি তোমাকে এখন যত ভাল বাসি,এরচেয়ে আরও বেশী ভাল বাসিব। কথাটা যদি অপ্রিয় হয়, তাহ'লেও আমি যে ভালবাসার কথা বলিলাম, তাহার এক তিলও এদিক ওদিক হবে না। ঠিক থাকিবে, সরলা ভয়ে জড়সড় হইয়া—চিন্তিত ও বিষণ্ণ হইয়া বলিল—মা, তুমি বল, তোমার কথার ঠিক উত্তর দিতে চেষ্টা ক'র্‌ব।

ম। চেষ্টা নয়, ঠিক কথা ব'ল্‌তেই হবে।

স। আচ্ছা, তবে নিশ্চয়ই ব'ল্‌ব।

ম। সে দিন শিশিরের সঙ্গে কি কি কথা হ'লো, আমার শুন্‌তে বড়ই ইচ্ছা হয়েছে—দেখো একটী কথাও যেন এদিক্ ওদিক্ না হয়।

সরলা সমস্ত কথাই বলিল, তার কথার উত্তরে শিশির যাহা বলিয়াছিল, তাহাও বলিল। মনোরমা সরলাকে বলিলেন—তুমি যে সত্য বলিলে এজন্য আমি অত্যন্ত সুখী হইলাম—আর তোমাকে যে বেশী ভাল বাসিব বলিয়াছি, তাহাও তুমি আজ ইহাতে স্থির জানিবে। আমি তোমাকে আমার খুকীর মত ভাল বাসিব। তুমি

বড় মেয়ে, খুকী ছোট মেয়ে। আর তোমার সঙ্গে তার নামের মিল রাখিবার জন্য তার নাম রাখিব মুরলা। সরলা সত্য কথার পুরস্কার পাইয়া আনন্দে চক্ষের জলে ভাসিতে লাগিল, কিন্তু যেন কিছু বলা হয়নি বলিয়া সরলার মনটা তখনও ভার ভার ছিল—বিদ্যুৎ চমকের ন্যায় সরলা কাঁপিয়া উঠিল দেখিয়া মনোরমা বলিলেন—সরলা, তুমি শিহরিয়া উঠিলে কেন? তখন সরলা কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল—মা, একটা কথা বল্‌তে ভুলে গিছি।

ম। এখন বল, সেটা কি কথা।

স। সে কথাটা একা একা বলিয়াছিলাম।

ম। কি বলিয়াছিলে?

স। বলিয়াছিলাম "পোড়া আমি মরিলেই ত সব গোল মিটে যায়।" মনোরমা সেলাই ফেলিয়া সরলাকে ক্রোড়ে বসাইয়া বার বার মুখচুম্বন করিয়া বলিলেন—সোণার চাঁদ আমার, তুমি ম'র্‌বে কেন? ছি! অমন কথা কি ব'ল্‌তে আছে। তুমি আমার কথা শুনিয়া চলিবে—কোন কথা গোপন করিও না—পরিণামে ভাল হবে। আমি তোমাকে যে পথে চলিতে বলিব, সে পথে চলিয়া তুমি শেষে সুখশান্তি লাভ করিয়া সুখী হইতে পারিবে। তোমাকে ঘরে আনিয়াছি—তোমাকে লালনপালন করিতেছি—তুমি সুখী হইলে, তাহাতে আমার প্রাণে কত সুখ হয়, তুমি বালিকা এখন হয়ত বুঝিতে পার না—বড় হইয়া যখন তুমি আবার আমার মা হবে, তখন বুঝিতে পারিবে মেয়ে ভাল হ'লে, মায়ের কত সুখ হয়।

ষড়বিংশ পরিচ্ছেদ।

ভবিষ্যতের গর্ভে।

মনোরমা আজ সেলাই করিতে করিতে সরলার মনটীকে সেলাই করিয়াছেন। সরলা আজ বৈকালে এক নূতন শ্রীধারণ করিয়া ইতস্ততঃ বিচরণ করিতেছে। আজ তাহাকে দেখিয়া বোধ হইতেছে, সে যেন পৃথিবী জয় করিয়াছে, অথচ তাহাতে জয়ের অহঙ্কার নাই—জাঁকজমক নাই। শান্ত মূর্ত্তি—স্নিগ্ধ ভাব—মিষ্ট কথা, আজ তাহার ক্ষুদ্র দেহের লাবণ্য ও চঞ্চল চিত্তের স্ফুর্ত্তি বৃদ্ধি করিয়াছে—আজ তাহাকে দেখিলেই কথা কহিতে—কথা কহিলেই কোলে টানিতে ইচ্ছা হয়,বাস্তবিক তাহাকে এমনই সুন্দর দেখাইতেছে। আজ তাহার ভাবভঙ্গী, আচার আচরণ সমস্তই যেন মধুমাখা বলিয়া বোধ হইতেছে। অবিনাশের মা আজ সরলাকে দেখিয়া একটু প্রীত হইলেন, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার মুখে যেন একটা ঘন বিষাদের ছায়া পড়িয়া গেল। অবিনাশের মা এখনও জানিতে পারেন নাই যে মনোরমার ভালবাসাপূর্ণ কোমল করস্পর্শে—তাঁহার সুমিষ্ট স্নেহচুম্বন লাভে—তাঁহার শান্তিপূর্ণ ক্রোড়ে বসিয়া, সরলা আজ নিজেকে ও মনোরমাকে জয় করিয়াছে, তিনি এখনও জানিতে পারেন নাই যে প্রীতি ও প্রসন্নতার স্পর্শ পাইয়া সরলা আজ হৃদয়দ্বার খুলিয়া মনোরমার নিকট আত্মবিক্রয় করিয়াছে, তিনি জানেন না সরলা আজ কি ধন পাইয়া আত্মবিক্রয় করিয়াছে।

সরলা আজ নিজ সরলতা গুণে মনোরমার প্রশস্ত প্রাণ অধিকার করিয়াছে, সে প্রাণের মধ্যস্থলে আসন পাতিয়া তাহাতে বসিতে পাইয়াছে। সরলার আজ লাভের দিন, মানুষ যখন

আপনাকে দিয়া অন্যকে কিনিতে যায়, তখনই কেবল এইরূপ ঘটিয়া থাকে। আপনাকে দিয়া লোক যতই পরকে আপনার করিতে শিখিবে, ততই সংসারে মনোরমা ও সরলার অভিনয় দেখিতে পাওয়া যাইবে।

সরলার সরলতার উচ্ছ্বাস ও অসংযত স্ফূর্ত্তির অভিনয় দেখিয়া অবিনাশের মা ভাবিলেন আজ নিশ্চয়ই নূতন কিছু ঘটিয়া থাকিবে। এইরূপ স্থির করিয়া তিনি মনোরমার কক্ষে গেলেন। সেখানে গিয়া দেখিলেন মনোরমা নিবিষ্ট চিত্তে একখানি বই পড়িতেছেন। নিকটে গিয়া দেখিলেন একখানি সংস্কৃত পুস্তক—সংস্কৃত শ্লোক, ও তাহার বাঙ্গলা ব্যাখ্যা দেওয়া আছে। মলাটের উপর লেখা রহিয়াছে "চাণক্য শ্লোক সংগ্রহ।" তখন তিনি একটু পরিহাসের স্বরে বলিলেন—সর্ব্বনাশ! কি করিছি, বউমানুষ হ'য়ে ভুলে তর্কসিদ্ধান্তের ঘরে এসে পড়িছি, ছি—ছি, কি লজ্জার কথা! ভট্‌চায্যি মশাই কি ভাব্‌বেন্। আমি কোথায় যাব—গো—এই বলিয়া পলায়নোদ্যত হইতেছেন দেখিয়া মনোরমা পশ্চাৎ হইতে ধরিলেন; ধরিয়া বলিলেন, তোমাকে আমার প্রধান ছাত্রী কর্‌ব। অনেক ঔষধ যেমন তিন দিন খেলেই ব্যারাম সারে, আমার কাছে তেমনি তিন দিন পড়্‌লেই একটা পদবী পাইবে, তোমাকে 'তর্ক-চাম্‌চিকে' পদবী দিব। তখন তোমাকে দেশ বিদেশের লোক চিন্‌বে। এমন কি বড় লাট সাহেবের দরবারেও তোমার নাম জাহির হবে, তা হ'লে তোমার রাগ, তোমার গায়ের জ্বালা জুড়োবে ত?

ম। এত রাগ কেন দিদি, বসো না?

দি। ব'স্‌বো না, একটা কথা জান্‌তে এসিছি।

ম। কি কথা? বল না।

দি। সরলার আজ কি হয়েছে?

ম। কেন বল দেখি, সে কি কিছু অন্যায় কাজ করেছে ?

দিদি বলিলেন—না না, তা নয়, সে এতদিন আমাদের বাড়ীতে এসেছে, কিন্তু আজ তাকে যেমন সরল ও সুন্দর বলিয়া বোধ হইল, আজ তাকে দেখিয়া যেমন সুখ হইল, এমন আর কখনও হয় নাই, আজ তাকে দেখে চক্ষু জুড়াইয়া গেল। মনোরমা বলিলেন, দিদি, বোধ হয় তোমার চাউনিতে কেউ কিছু তুক্‌তাক্ ক'রেছে। তুমি যখন ঘুমিয়েছিলে, তখন বোধ হয় সেই ইংরাজ কবিকুলচূড়ামণির কল্পনাপ্রসূত পাতার রস তোমার চখে কেউ ঢালিয়া দিয়াছে, তাই আজ সব প্রেমময় দেখিতেছ। দিদি বলিলেন—আঃ—তুমিও যে দেখি আজ স্ফূর্ত্তিভরা! কেন কি হ'য়েছে, কিসের আমোদে ডুবেছ? তোমার প্রাণের কুলে কুলে যে হাওয়া দিয়েছে, কিসের আমোদ ?

তখন মনোরমা সকল কথা ভাঙ্গিয়া বলিয়া—বলিলেন, দেখ দিদি, ভাল না বেসে লোককে ভালকরা যায় না। প্রেমের শাসনই শাসন, প্রেমের শিক্ষাই প্রকৃত শিক্ষা।

দিদি বলিলেন, দেখ, সে ভাল হউক, সে সুখে থাকুক কায়মনোবাক্যে এই আশীর্ব্বাদ করি, কিন্তু দেখ যেন আমার ঘাড়ে চাপাইও না।

মনোরমা গম্ভীরভাবে ক্ষণকাল নতমুখে দাঁড়াইয়া রহিলেন। শেষে দিদির হাতখানি ধরিয়া অতি কাতর ভাবে বলিলেন, দিদি, ওকে মেয়ের মত মানুষ করিতেছি, ওকে তোমার ঘাড়ে চাপাইয়া দিয়া তোমাকে বিপন্ন করিব কেন ? আর এমন কথা তোমার মুখে শুনিব স্বপ্নেও ভাবি নাই, ও যদি ভাল হয়, আর তোমরা যদি যেচে নাও, তবেই দেব, তা না হ'লে দেব কেন? আজ আমি তার ষোল আনা মা হ'ইছি। মেয়ের জন্য যাহা করিতে হয়, সমস্তই করিব। তবে আমার একটা আশঙ্কা এই যে, তোমরা

এত বিরোধী হইলে তাকে সংসারে সম্পূর্ণরূপে সুখী করিতে পারিব না। ভগবানের ইচ্ছায় কখন তোমাদের মতিগতি যদি ফেরে, তাহ'লেই মঙ্গল, তা না হ'লে চিরদিনই তার প্রাণে একটা দুঃখের দাগ থাকিয়া যাইবে। সে এখন বালিকা, বিবাহ কি, ভালবাসার মূল্য কত, ভালবাসায় জীবন মৃত্যু লুক্কায়িত, এ সকল সে বুঝে না, যখন বুঝিবে এ সকল কি, আরও বুঝিবে তোমরা তাহার ভালবাসার পাত্র লাভের বিরোধী, তখন চিরদিনের জন্য তাহার চঞ্চলতা, তাহার প্রাণের প্রসন্নতা অপহৃত হইবে। তাহার শরীরের বল ও মনের উৎসাহ তিল তিল করিয়া হ্রাস হইবে। এক জনের এমন ক্ষতি করিবার পূর্ব্বে বিষয়টা বিশেষভাবে ভাবিয়া দেখা কর্ত্তব্য। শাস্ত্রে বলে ঃ—

বিষাদপ্যমৃতং গ্রাহ্যমমেধ্যাদপি কাঞ্চনং।
নীচাদপ্যুত্তমাং বিদ্যাং স্ত্রীরত্নং দুষ্কুলাদপি ॥

বিষ প্রাণ হনন করে সত্য, কিন্তু তার মধ্যে অমৃত থাকিলে গ্রহণ করিবে। অধম স্থান সর্ব্বদাই পরিত্যজ্য হইলেও, সেখানে স্বর্ণ থাকিলে গ্রহণযোগ্য। নীচজনের সঙ্গ প্রশস্ত নহে, তথাপি সে ব্যক্তি হইতে শ্রেষ্ঠ জ্ঞান লাভের নিষেধ নাই। হীনবংশের সম্বন্ধ সর্ব্বদাই পরিহার করা কর্ত্তব্য হইলেও, গুণসম্পন্না কন্যা হীনবংশ-সম্ভূত হইলে আদরে গ্রহণ করিবে। সরলা দুঃখিনী হইলেও ত ভদ্রঘরের মেয়ে, তোমরা না চিনিলেও ওর মামারা তোমাদের জ্ঞাতি। এখন সে যদি সৎস্বভাবা ও সুশীলা হয় তাহ'লে শাস্ত্রানুসারে সেইত সর্ব্বোৎকৃষ্ট পাত্রী। অবিনাশের মা বলিলেন, দেখ, এ সকলই বুঝি, কিন্তু তবুও কুড়োন মেয়ে ব'লে বড় ভয় হয়। অসুখী হওয়া অপেক্ষা সাবধান হওয়াই বিবেচনার কাজ বলিয়া বোধ হয়। মনোরমা কথা শেষ করিতেছিলেন, পুনরপি নূতন উৎসাহের সঙ্গে বলিলেন—দিদি, মেয়েটীর সকল গুণ

থাকিলেও তাহার সুখ দুঃখের প্রতি তোমরা উদাসীন হইতে পার, কিন্তু একটী কথা স্মরণ রাখিবে যে, অবিনাশ যখন পড়াশুনার অনুরোধে গৃহত্যাগ করিয়া শিবপুর এঞ্জিনিয়ারিং কলেজে গেল, তখন বাড়ী হইতে দূরে যাইতে হইতেছে বলিয়া সে আমাদের প্রত্যেকের গলা জড়াইয়া কাঁদিয়াছে, সরলার কচি কচি হাত দুখানি ধরিয়াও তদপেক্ষা অধিক কাঁদিয়াছে, তাহাকে কত সাবধানে থাকিতে বলিয়াছে, তাহাকে কত সদুপদেশ ও সুপরামর্শ দিয়াছে, তাহাকে কত আদর করিয়াছে, অবিনাশের মনে সরলার চিন্তা যে স্থান পাইয়াছে তাহাতে কোন সন্দেহ নাই, তবে সে খুব ভাল ছেলে, তোমাদের ব্যবস্থাই তার ব্যবস্থা, সে কখন তোমাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে চলিবে না।

অবিনাশের মা বলিলেন—দেখ, আমরাও সেই জন্য একটু বেশী বিপদে পড়িয়াছি। আমাদের রুচি, ইচ্ছা ও পছন্দ অপেক্ষা তার সুখ, শান্তি ও আরামের দিকে বেশী দৃষ্টি রাখা আবশ্যক। আমরা বুঝিছি যে সরলার সঙ্গে বিবাহ হওয়াই অবিনাশের মনোগত ইচ্ছা, কিন্তু সে কখনও সে কথা বলিবে না। আমরা যেখানে স্থির করিব সে সেইখানেই বিবাহ করিবে। ইহাইত আমাদের পক্ষে কঠিন সমস্যা। মনো, এ কথা আমরা বেশ জানি যে সরলার কাছে অবিনাশের কথা হইলে সরলা জড়সড়, অপ্রতিভ হইয়া একপাশে বসিয়া থাকে, অবিনাশের বিরুদ্ধে কোন কথা হইলে সরলা উঠিয়া যায়, আবার অবিনাশও সরলার নিন্দা সহ্য করিতে পারে না, অত শান্ত ছেলে, কিন্তু সরলার বিরুদ্ধে কোন কথা হইলে অমনি সাপের মত ফোঁস করিয়া উঠে। এ সকল জেনেও আমাদের ইচ্ছা নয় যে সরলার সঙ্গে অবিনাশের বিবাহ হয়। তবে সরলার ভাবী আচার ব্যবহারে যদি এ অনিচ্ছার প্রকোপ হ্রাস হয়, তবে সে স্বতন্ত্র কথা। বিবাহ ভবিতব্যের

কথা, প্রজাপতির নির্ব্বন্ধ, যদি বিধাতার ইচ্ছা হয়, আমাদের কি শক্তি যে বাধা দিই।

সপ্তবিংশ পরিচ্ছেদ।

ফটোগ্রাফে।

দুঃখের দিন কাটিতে বিলম্ব হইলেও হইতে পারে, কিন্তু সুখের দিনগুলি বড় শীঘ্র কাটিয়া যায়। দেখিতে দেখিতে মনোরমার সুখের সংসার চতুর্দ্দশ বর্ষ অতিক্রম করিয়া পঞ্চদশ বর্ষে পদার্পণ করিয়াছে। তাঁহাদের জীবনে যুগান্তর উপস্থিত হইলেও যেন সে দিন সংসার পাতিয়াছেন বলিয়া বোধ হইতেছে। মনোরমা পীড়িতা হইয়া মায়ের সঙ্গে রামগোপাল বাবুর বাসায় আসিয়াছিলেন, সে যেন সে দিনকার কথা বলিয়া বোধ হইতেছে, সেই দীন বেশ, ক্ষীণ দেহ ও অশান্তি পূর্ণ হৃদয় সহসা যেন কোন যাদুকরের সুকৌশলে—মন্ত্রবলে সম্পন্ন অবস্থায়, সুস্থ দেহে, শান্তি ও সুখপূর্ণ অন্তরে পরিণত হইল, সে যেন কল্যকার ব্যাপার বলিয়া মনে হইতেছে, সংসার পাতিয়া বসিতে না বসিতে, সংসারের নানাপ্রকার অভাবের সহিত সংগ্রাম করিতে করিতে, মনোরমা ও শরৎচন্দ্র যে আবার নানাপ্রকার সদনুষ্ঠানে সক্ষম হইবেন, ইহা কখন স্বপ্নেও ভাবেন নাই। তাঁহাদের সকল প্রকার কার্য্যের মধ্যে প্রধান সুখের কাজ এই যে সরলার ন্যায় আরও দু একটী অনাথা বালিকা তাঁহাদের গৃহে স্থান পাইয়াছে। সংসারে স্ত্রীলোক যত সহজে বিপন্ন হয়, পুরুষের সেরূপ হইতে হয় না। শত সহস্র প্রকার বাধা বিপত্তির ভিতর পড়িয়া পুরুষমানুষ চেষ্টা করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইতে পারে। আজ যে ব্যক্তি মূর্খ, কা'ল

সে অধ্যবসায় গুণে বিদ্বান হইতে পারে, আজ যে দরিদ্র কা'ল সে বুদ্ধি ও শ্রমশীলতাগুণে ধনী হইতে পারে, আজ যে অসৎ পথে বিচরণ করিতেছে,—পাপাচার যাহার নিত্য সহচর হইয়াছে—প্রতি দিনই সংসারের মুখকে মলিন করিয়া দিতেছে, কা'ল সে সৎসঙ্গের গুণে, সৎপথে পদার্পণ করিয়া আত্মোন্নতি করিতে, মান সম্ভ্রম ও সুখ সম্পদ সম্ভোগ করিতে পারে, কিন্তু স্ত্রীলোক একবার পড়িলে—একবার সে সংসারের পথে হীন ও ঘৃণিত হইলে—একবার সে আপনাকে হারাইলে, আর নিজেকে খুঁজিয়া পায় না। লোকের ঘৃণাব্যঞ্জক দৃষ্টি হইতে—লোকের প্রদত্ত হীনতা হইতে আপনাকে রক্ষা করিতে পারে না। সংসারের সে কঠিন মুদ্গার সেই যে তাহার মাথার উপর পড়ে, আর কখন তাহাকে উঠিতে দেয় না।

শরৎচন্দ্র ও মনোরমা এই সত্যটী অতি সুন্দররূপে অনুধাবন করিয়াছেন, তাই সংসারের অনাথা বালিকাদিগকে কুড়াইয়া আনিয়া নিজ গৃহে স্থান দিতেছেন এবং তাহাদের সুশিক্ষা লাভের জন্য, তাহাদের ভবিষ্যৎ মঙ্গলের জন্য, পরিজন সহ নিরন্তর শ্রম করিতেছেন। সকল কাজের মধ্যে এইটীই তাঁহাদের প্রধান কাজ বলিয়া মনে হয়। এবং এই জন্যই তাঁহাদের জীবনের অধিকাংশ সময়, গৃহের অধিকাংশ স্থান ও উপার্জ্জনের অধিকাংশ অর্থ এই কার্য্যের জন্য ব্যয় করেন। যাহাদের জন্য সংসারের আর দশ-জন কিছু না কিছু করিয়া থাকে, তাহাদের অপেক্ষা ইহাদিগকে অধিক কৃপার পাত্র জানিয়া ইহাদের সেবাতেই বিশেষ সুখানুভব করিয়া থাকেন। যে সকল বালিকাকে গৃহে স্থান দিয়াছেন, তাহাদের সুশিক্ষা ও সৎ স্বভাব লাভে নিরন্তর চেষ্টা করিতেছেন। তাহাদের আচার আচরণের মধ্যে যখনই নিজেদের আশানুরূপ কিছু দেখিতে পান, তখনই আনন্দ প্রকাশ করিয়া থাকেন।

সরলাই সকলের বড়। সে এগার বৎসর অতিক্রম করিয়া দ্বাদশে পড়িয়াছে। মনোরমা এত দিন এই ভাবিতেছিলেন, কোন প্রকারে সরলার কাজকর্ম্ম, চা'ল চলনের মধ্যে একটা পরিবর্ত্তন ঘটাইতে পারিলে ক্রমে অন্য সকলকেই আয়ত্ত করিতে ও সৎ পথে চালাইতে পারিবেন। বিধাতার কৃপায় সে দিন, মনোরমার সে অভিষ্ট সিদ্ধ হইবার সূত্রপাত হইয়াছে। সরলা সেই যে তাঁহার অনুগত হইয়া চলিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছে, সেই দিন, সেই মুহূর্ত্ত হইতে তাঁহার নির্দ্দেশ মতে জীবন পথে চলিতে প্রয়াস পাইতেছে। মনোরমা বুঝিলেন এই পরিবর্ত্তন স্থায়ী হইলে সরলার ও অন্যান্য বালিকাদিগের প্রভূত কল্যাণ সাধিত হইবে।

এমন সময়ে আর একদিন আহারান্তে মনোরমা সরলাকে লইয়া চন্দ্রপুলি ও ক্ষীরের ছাঁচ প্রস্তুত করিতে বসিয়াছেন। মনোরমা দেখিলেন, যে সকল সদ্‌গুণের অঙ্কুর সরলার জীবনে লুক্কায়িত ছিল, সুসময় পাইয়া তাহারা অঙ্কুরিত হইতেছে। মনোরমা সরলাকে বলিলেন—সরলা, তুমি এ কয় দিন যে ভাবে চলিয়াছ তাহাতে আমার বিশ্বাস হইয়াছে যে, এইরূপ শান্তভাবে সকল দিক রক্ষা করিয়া চলিলে, তোমার যথেষ্ট উপকার হইবে, আর আমাদের সকলের সুখের সীমা থাকিবে না। সরলা তার মায়ের প্রিয়সাধন করিতে পারিয়াছে মনে করিয়া পুলকে পূর্ণ হইল।

মনোরমা বলিলেন—সরলা, আজ তোমায় আর একটী কথা জিজ্ঞাসা করিতে চাই, তুমি তাহার ঠিক উত্তর দিলে অত্যন্ত সুখী হইব। সরলা বলিল— মা, আমি বলিয়াছি, তোমার কাছে আর কিছু লুকাইব না, তবে আর ও রকম ক'রে বল কেন? মনোরমা বলিলেন—সে দিন আমি যখন তোমাকে বাগান হইতে ডাকিয়া আনিলাম, তখন তোমার ভাব গতিক দেখিয়া বোধ

হইল, যেন তুমি কোন গোপনীয় কার্য্যে রত ছিলে, আর তা ফেলিয়া আসিতে তোমার ইচ্ছা ছিল না। খুব অনিচ্ছার সঙ্গে আমার পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিতে লাগিলে। সরলার মাথায় যেন বজ্রাঘাত হইল, মুখখানি একেবারে শুকাইয়া গেল, মলিন ও বিবর্ণ-মুখে সরলা নত দৃষ্টিতে বসিয়া রহিল। সত্য বলিতে প্রতিজ্ঞা করিয়া সে আজ মহাবিপাকে পড়িয়াছে। সে জানিত না যে সেদিনকার সে গুপ্তঘটনা কেহ জানিতে, বুঝিতে বা ভাবিতে পারিবে। মনোরমা বুঝিলেন এমন কিছু গুরুতর ঘটনা, যাহা সরলা নির্ভয়ে ও নিঃসংশয়ে কাহাকেও বলিতে সাহস করে না। তিনি ভাবিলেন মানুষ যতই সরল হউক না কেন, তবুও জীবনের এমন সকল ঘটনা থাকিবে, যাহা অকপটে অন্যের নিকট বলিতে সাহস করে না, আর তেমন সুহৃদই বা কোথায় মিলে, যাহাকে প্রাণের অভ্যন্তরের শেষ পর্দা খুলিয়া সকল ব্যাপার দেখাইয়া দুঃখের বিনিময়ে সুখ, ক্ষতি না হইয়া লাভ, মৃত্যুর পরিবর্ত্তে জীবন লাভ হইবে। এমন লোক কি সংসারে মিলে, যাহার হাতে জীবন সমর্পণ করিয়া জীবনের সকল দুর্ব্বলতা, ত্রুটী, অপরাধ ও পাপ তাপের কথা বলিতে ভয় হইবে না? তখন তিনি আপনার অবস্থা চিন্তা করিয়া দেখিলেন, সত্য সত্যই এমন লোক মিলে, যাহাকে সকল কথাই বলা যায়। কেননা তিনি নিজে কখনইত শরৎচন্দ্র হইতে কোন কথা, কোন গুরুতর আশঙ্কা বা বিপদের কথা গোপন করেন নাই। কেহ সম্পূর্ণ-রূপে কল্যাণাকাঙ্ক্ষাদ্বারা চালিত হইয়া কাহাকেও প্রেম করিলে, সে ব্যক্তি বুঝিতে পারে তাহার বিপদের সম্ভাবনা নাই। এমন অকপট সখ্যভাব না জন্মিলে মানুষ মানুষের নিকট হৃদয়দ্বার উদ্ঘাটন করিয়া সকল কথা বলে না। পর্দ্দার পর পর্দ্দা অপ্রকাশিত থাকিয়া যায়। মনোরমা মুহূর্ত্ত মধ্যে এই চিন্তালহরী অতিক্রম করিয়া সরলার বিষণ্ণ মুখখানি তুলিয়া ধরিয়া বলিলেন—মা, ভয় পাইয়াছ?

ভয় কি, আমি সত্য করিয়া বলিতেছি, তোমার প্রতি ভালবাসার একতিলও অভাব হইবে না, আর বেশী ভয়ের কথা হইলেও কেহ জানিতে পারিবে না। তুমি নির্ভয়ে আমাকে সকল কথা বল, বল, কোন ভয় নাই। তখন সরলা ক্ষণকাল শূন্যদৃষ্টিতে তার মায়ের মুখেরদিকে তাকাইয়া রহিল, মনোরমা আবার বলিলেন—সরলা, বল, কোন ভয় নাই, তোমার যে যাতনা হইতেছে, তোমার প্রাণের ভিতর যে গ্লানি হইতেছে, দেখিবে আমাকে বলিলে তোমার আর সে সকল ক্লেশ কিছুই থাকিবে না। তখন সরলা কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল—মা, তুমি আমায় কেন এমন কথা জিজ্ঞাসা ক'র্‌লে? আমি সে কথা তোমায় কিছুতেই ব'ল্‌তে পা'র্‌বো না। মনোরমা দেখিলেন বড় বিপদ, তখন চন্দ্রপুলি ও ক্ষীরের ছাঁচ গড়া প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে। তখন সে কাজ ফেলিয়া সরলাকে লইয়া নিজের ঘরে গেলেন, সরলা ভয় ও ভাবনাতে একেবারে কাঠ হইয়া গিয়াছে, সে কাঁপিতেছে। ঘরে গিয়া তাহাকে কোলে বসাইয়া শতবার মুখচুম্বন করিয়া বলিলেন—তোমাকে বলিতেই হবে, না বলিলে, ভয় ও ভাবনাতেই আমার আহার নিদ্রা বন্ধ হইবে, আমার অসুখ হবে, তোমার বাবু বাড়ী আসিয়া শুনিলে কত বিরক্ত হবেন।

তখন সরলা দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়িয়া ছোট ছোট হাত দুখানিতে বড় বড় চোখ দুটী ঢাকিয়া ভগ্নস্বরে বলিল—আমি সে কথা কি ক'রে ব'ল্‌বো? আমি ব'ল্‌তে পা'র্‌বো না। মনোরমা বলিলেন—লক্ষ্মী মা আমার, এসকল কথা আমি না জানিতে পারিলে তোমারই ক্ষতি, এই একটু আগে তুমিইত ব'লেছ—মা, তোমার কাছে কোন কথা গোপন ক'র্‌বো না, তবে আবার কেন এমন করো? লোক আর্‌সিতে যেমন মুখ দেখে, আমি চাই, ঠিক

সেই রকম তোমার দিকে তাকাইবামাত্র তোমার মনের সকল কথা জানিতে পারিব।

স। না—মা, আমি সে কথা ব'ল্‌তে পা'র্‌বো না।

ম। আচ্ছা, ব'ল্‌তে না পার, লিখে দাও।

স। (চমকিত হইয়া) লিখ্‌তে ত পা'র্‌বোই না।

ম। তবে কি হবে, আমাকে ব'ল্‌বে না ?

স। মা, আমাকে দয়া ক'রে ছেড়ে দাও।

ম। আমি জান্‌লে যদি তোমার উপকার হয় ?

স। তা হ'লেও আমার বড় লজ্জা করে।

ম। মায়ের কাছে মেয়ের কি এত লজ্জা হ'লে চলে ?

স। আচ্ছা ব'ল্‌বো—না, বল্‌তে পা'র্‌বো না।

ম। না বল্লে সকলের চেয়ে তোমারই বেশী ক্ষতি হবে। আর আমরা অত্যন্ত কষ্ট পাব, তোমাকেও আর বিশ্বাস ক'র্‌বো না।

সরলার মনে এতক্ষণ যে ইচ্ছা ও অনিচ্ছার যুদ্ধ চলিতেছিল, এই এক "বিশ্বাস ক'র্‌বো না" কথায় মর্ম্মাহত হইয়া সে অনিচ্ছাকে জয় করিয়া বলিল—তবে শোন, সে দিন কি করিতে ছিলাম। অবিনাশ দাদা যে দিন বাড়ী হইতে চলিয়া গেলেন, সেই দিন—সেই মুহূর্ত্ত হইতে আমি এ বাড়ী ঘর আঁধার দেখি, আমি পথে, ঘাটে, ঘরে, সর্ব্বত্রই যেন অবিনাশ দাদার ছায়া দেখিতে পাই, ভাল করিয়া তাকাইতে যাই, আর কিছুই দেখি না, সব যেন অন্ধকার বলিয়া বোধ হয়। আমি বসিয়া পড়ি, আর উঠিতে ইচ্ছা হয় না মা, তুমি যে আমায় অবিনাশ দাদার মত ভালবাস, তা ত আমি কেবল সে দিন বুঝিতে পারিলাম। তার আগেত আর আমি জানিতাম না। আমি জানি আমাকে সেই একজনই কেবল এ সংসারে ভালবাসেন। কত

সময়ে কত অন্যায় কাজ করিছি, কত দুষ্টমি করিছি, কেমন ভালবেসে, কেমন আদর ক'রে, আমার সেই সব দোষ সারিতে চেষ্টা করিয়াছেন। তিনি বাড়ী ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছেন। তোমার আদর ভালবাসা পাইয়া, তোমার কোলে সেদিন বসিতে পাইয়া আমার চারিদিক অন্ধকার দেখা সারিয়াছে। আমার বুকের ভিতরে অবিনাশ দাদার যে ফটোগ্রাফ উঠিয়াছে, সে দিনকার ঐ ঘটনার পূর্ব্বে, তাই দেখিয়া আমি কেবল তাঁর ছবি আঁকিয়াছি। একা একা বসিয়া সেই ছবি দেখি, আর আদর করিয়া সেই ছবিকে কত কথা বলি, রাগ করিয়া কত বকি, কত ঝগড়া করি, আবার কত আদরও করি।

অষ্টবিংশ পরিচ্ছেদ।

চিত্র দর্শনে।

মনোরমা সরলার এই বালিকাভাবপূর্ণ নির্ম্মল ভালবাসার উচ্ছ্বাস দেখিয়া ক্ষণকাল নীরবে অশ্রু বিসর্জ্জন করিলেন, সরলাও জড়সড় হইয়া সম্মুখে দাঁড়াইয়া মনোরমার নেত্রনীরে সিক্ত হইতে লাগিল। মনোরমার অশ্রুবিন্দু সকল সরলার মাথায় যেন অমৃত সিঞ্চন করিল। সরলা প্রাণ পাইয়া, সতেজ হইয়া মায়ের মুখের-দিকে তাকাইল। মনোরমা বলিলেন—সরলা, যে ছবি আঁকিয়াছ, তাহা কি আছে, দেখাতে পার কি? সরলা বলিল, সে ছবি ভাল হয়নি, আমি দেখাবো না। মনোরমা বলিলেন—যাও, নিয়ে এস, ভাল হউক আর মন্দ হউক আমি দেখ্‌বো। তখন সরলা নিজের ইচ্ছা খর্ব্ব করিয়া মায়ের আদেশ পালনে অগ্রসর হইল।

মুহূর্ত্ত মধ্যে সরলা ছবি আনিল। তখন মনোরমা কাগজের পর্দ্দা খুলিতে খুলিতে দেখিলেন, অবিনাশ যে ভাবে, যে পোষাকে সকলের নিকট বিদায় লইয়াছিল, সেই পোষাক, সেই ভাব সরলার তুলিতে পূর্ণরূপে প্রস্ফুটিত হইয়াছে। তখন তিনি সরলার দিকে তাকাইয়া বলিলেন—এ ত বেশ হ'য়েছে, অমনি সরলা লজ্জায় মাথা হেঁট করিয়া দাঁড়াইয়াছে, আর তিনি এই ক্ষুদ্র বালিকার নিপুণতার প্রশংসা করিয়া বলিলেন—তোমায় ভাল করিয়া চিত্র শিখাইবার জন্য আমি আরও বেশী টাকা বেতন দিয়া ভাল মাষ্টার রাখিয়া দিব।

এমন সময় অবিনাশের মা সেখানে আসিতেছেন দেখিয়া সরলা অতি কাতর দৃষ্টিতে মনোরমার মুখেরদিকে তাকাইল, সে দৃষ্টিতে বোধ হইল, সে যেন বলিতেছে—মা, দোহাই তোমার জেঠাইমাকে দেখাইও না, তিনি রাগ করিবেন।

মনোরমা দিদিকে দেখিয়া কাগজ খানি লুকাইলেন। দিদি আসিতে আসিতে কাগজ খানি লুকাইতে দেখিয়া ঘরের বাহিরে যাইতেছিলেন, মনোরমা তাঁহাকে ডাকিয়া ফিরাইলেন। সরলাকে বলিলেন—তুমি রান্নাঘরে যাও। সরলা চলিয়া গেল।

দি। আমাকে দেখিয়া কি লুকাইলে ?

ম। যদি ব'ল্‌বো, তবে লুকুলুম্ কেন ?

দি। সরলার সাম্‌নে যদি আমাকে না দেখাও ।

ম। তার সাম্‌নে ত ওটী আমার হাতেই ছিল।

দি। সরলা আর আমি একত্রে দেখ্‌বো না, এমন কিছু যদি হয়।

ম। আচ্ছা বল দেখি, এমন কি জিনিস্ হ'তে পারে ?

দি। চিঠি পত্র হ'তে পারে, কোন ফুল কি ফুলগাছের ছবি হ'তে পারে।

ম। তা তোমায় দেখাবো না কেন ?

দি। তবে কি ব'ল্‌তে পারি না।

ম। ভাব না, ভাব না, ব'ল্‌তে পার্‌বেকোন্।

দি। তবে কি কোন মানুষের ছবি ?

ম। আচ্ছা তাই যদি হয়, তাহ'লে কার ছবি বল দেখি।

দি। সে দিন ত মহারাণীর ছবি আঁক্‌ছিল, মহারাণীর ছবি কি ?

ম। তাই বা লুকোবো কেন ? তুমি বুঝি দেশে আর লোক পেলে না ? তা হ'তে পারে, সে তার মহারাণীর ছবিই এঁকেছে।

দি। তার মহারাণী কি রকম্ ?

ম। মহারাণী ত রাজার কাজ করেন, সুতরাং তিনিই রাজা। সরলা তার রাজার মূর্ত্তি চিত্র করিয়াছে।

দি। তার রাজা কে ?

ম। দেখ দেখি তার রাজা কে ?

এই বলিয়া মনোরমা আস্তে আস্তে ছবিখানি খুলিতে আরম্ভ করিলেন। অবিনাশের মা দেখিয়া চিনিতে পারিয়াছেন, বড়ই সুন্দর দেখিতেছেন, আনন্দে তাঁহার হৃদয় নৃত্য করিতেছে, অধর ওষ্ঠ স্পন্দিত হইতেছে, চক্ষুপ্রান্তে আনন্দাশ্রু তরঙ্গ তুলিয়া নৃত্য করিতেছে, মুহূর্ত্ত মধ্যে তাহারা মহা উচ্ছ্বাসের সঙ্গে চারিদিকে ছুটাছুটি করিবে, তাহার আয়োজন করিতেছে। কিন্তু তবুও অবিনাশের ছবি বলিয়া বিশ্বাস হইতেছে না। তিনি বলিলেন— যার ছবি বলিয়া আমার মনে হইতেছে, তার ছবি কেমন ক'রে হবে ? মনো, এ কি আমার অবিনাশের ছবি ? হ্যাঁ তাইত, এই যে বাছা আমার যাবার দিন যে কোট পরিয়াছিল এ যে সেই কোট, দেখি দেখি দ্যাওতো, এ যে বেশ সুন্দর হয়েছে ! সরলার আঁকা ! কি ক'রে এমন সুন্দর ছবি সে আঁক্‌লো !! ঠিক্

যেখানে যেটী হবে তার একটুও এদিক ওদিক হয়নি ! বাছার আমার চোখের কোণের কাটার দাগটী পর্য্যন্ত ঠিক হয়েছে গা ! !

ছবিখানা হাতছাড়া হইয়াছে। মা, জেঠাইমা, ছবিখানা দেখিয়াছেন, কি বলেন জানিবার জন্য সরলার মনটা ছট্‌ফট্ করিতেছে। রান্নাঘরে বসা দূরের কথা সে স্থির হইয়া দাঁড়াইতে পারিতেছে না। কতবার তার মায়ের ঘরের জানালার কাছে আসিয়া কাণ পাতিয়া শুনিতে চেষ্টা করিয়াছে মা ও জেঠাইমা কি বলিতেছেন। সরলা শুনিল, মনোরমা তাঁর দিদিকে বলিতেছেন—দেখ ওকে তোমরা দুরন্ত ও চঞ্চল বল, কিন্তু চঞ্চল, দুরন্ত লোক কি এমন স্থিরভাবে বসিয়া এমন নিপুণতার পরিচয় দিতে পারে ? দিদি বলিলেন মনো, আমি সরলার কাজ দেখিয়া অবাক্ হইয়া গিয়াছি, কি আশ্চর্য্য শক্তি ! এই একখানা ছবি আঁকিয়া সরলা চিরদিনের মত আমাকে কিনিয়া রাখিল। মনো, তুমি সরলাকে জিজ্ঞাসা কর সে ছবিখানা আমাকে দেবে কি না।

ডাকিতে না ডাকিতে সরলা নতমস্তকে দরজার সম্মুখে হাজির হইল। অবিনাশের মা সরলার মুখখানি তুলিয়া ধরিয়া স্নেহভরে ঘন ঘন চুম্বন দিয়া বলিলেন—মা লক্ষ্মী, তোমার সাত খুন মাপ। তোমার দুরন্তপনা ও দুষ্টমির দণ্ডস্বরূপ এই ছবিখানা আমি কেড়ে নেব—আর তোমার একখানা ছবি তুলাইয়া ইহারই পাশে রাখিয়া দিব, কেমন ? সরলা একটী কথাও কহিল না, নীরবে অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিল।

অবিনাশের মা কখন যাহা করেন নাই, আজ তাহা করিয়াছেন। অনাথা বালিকা সরলার দুষ্টমিভরা সুন্দর মুখখানি কখনও তুলিয়া ধরেন নাই, কখন সে চাঁদ মুখে তাঁর স্নেহ চুম্বন পড়ে নাই, আজ সরলা তার নিজ গুণপনায় তাঁর হৃদয় ক্রয় করিয়া তাঁর প্রাণ মন অধিকার করিল বটে, কিন্তু সে বালিকা-চরিত্রের

সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গুণ এই যে, সকলে যখন তাহাকে মন্দচক্ষে দেখিতেন, সে তখন যেমন অল্পই কাতর হইত, এখন আবার ঠিক সেইরূপ এত স্নেহ মাখান প্রশংসার মধুর নিক্বণেও সে অধিক উত্তেজিত, উৎফুল্ল বা অহঙ্কৃত হইল না। সরলতাই সরলার প্রধান গুণ—গৌরবের জিনিস। একদিন যে তাহার স্বপ্নময় ভাবী জীবন সুখ ও শান্তি-পূর্ণ হইবে আজ তাহার সূত্রপাত হইল। কিন্তু সে, তাহার কিছুই বুঝিল না, কেবল বুঝিল যে, জেঠাইমা তার উপর বড় বিরক্ত ও নারাজ ছিলেন—আজ তাঁর সে তীব্র বিরক্তির প্রকোপ কিঞ্চিৎ খর্ব্ব হইল। আজ হইতে তার প্রতি তাঁর প্রসন্ন দৃষ্টি পড়িল।

ঊনত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

মৃত্যুর পরে।

সংসার এমনি ক্ষণভঙ্গুর, এমনি ক্ষণস্থায়ী, এমনই অল্পায়ু যে, কে কখন চলিয়া যায় তাহার নিশ্চয়তা নাই। লোক যে প্রতিদিন নানা প্রকার বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া জীবন ধারণ করে, ইহাই এক আশ্চর্য্য ব্যাপার। শরৎচন্দ্রের বৃদ্ধ মাতামহ পীড়িত হইয়া প্রায় মাসাধিক কাল শরতের গৃহে আসিয়া বাস করিতেছেন। তাঁহার শুশ্রূষা ও সেবাতে সকলে একবারে অবসন্ন হইয়া পড়িয়া-ছেন। মনোরমার সেবাই তাঁহার বেশী ভাল লাগে, এজন্য মনোরমাকে অত্যধিক পরিশ্রম করিতে ও রাত্রি জাগিতে হইতেছে। চিকিৎসারও কোন প্রকার ত্রুটি হইতেছে না। কিন্তু তাঁহার কোষ্ঠীতে লেখা ছিল যে, কাশীপুরে তাঁহার দৌহিত্রের বাটীতে

চৌষট্টি বৎসর বয়সে তিনি গঙ্গালাভ করিবেন। বৃদ্ধের ভাগ্য প্রসন্ন, অনেক বার কোষ্ঠীর লিখিত কথা বিফল হইলেও এবারকার কথাটা সত্য হইল। তিনি বহু আত্মীয়, পুত্র কন্যা ও তাহাদের শাখাপ্রশাখা পরিবেষ্টিত হইয়া মনোরমা ও অবিনাশের মায়ের ক্রোড়ে শয়ন করিয়া শরৎ ও রামগোপাল বাবুর অশ্রুপ্লাবিত চক্ষের সমক্ষে নিশ্চিন্ত মনে হরিনাম করিতে করিতে দেহ ত্যাগ করিলেন। দেহ ত্যাগের এক ঘণ্টাকাল পরে যখন মৃতদেহ গঙ্গাতীরে লইয়া যাইবার আয়োজন হইতেছে তখন তাঁহার প্রবাসী পুত্র অনুপচন্দ্র ঘোষ (মুনসেফ্) কর্ম্মস্থান হইতে বিদায় লইয়া পিতাকে দেখিবার জন্য আসিয়া উপস্থিত হইলেন। পিতাকে জীবদ্দশায় একবার শেষ দেখিতে পাইলেন না, তাঁহার ক্ষোভ ও পরিতাপের সীমা রহিল না। অনেক দুঃখের কথা শোকাশ্রুর সহিত মিলাইয়া দিলেন।

এ দেশে এরূপ বয়সে মৃত্যু হইলে তাহাতে লোক আর ক্ষতি বোধ করে না, ইহার কারণ এই যে, দেশের লোক এত অল্পায়ু হইয়া পড়িয়াছে যে, ষাট্‌ পঁয়ষট্টি বৎসর বয়স হওয়াটা একটা আশ্চর্য্য ব্যাপার বলিয়া লোকের সংস্কার জন্মিতেছে। পরিণত, প্রবীণ ও ত্রিকালদর্শী লোকের উপদেশ ও পরামর্শই সমধিক মূল্যবান বলিয়া পূর্ব্বকার লোকদের ধারণা ছিল, এজন্য লোক যত্ন সহকারে তাহা গ্রহণ করিত। এখন আর সে ভাব নাই, এক্ষণে আর সেরূপ লোক পাওয়া যায় না, পাইলেও কেহ মানে না। নূতন ভাব, নূতন চিন্তা আজ কালকার নব্য সম্প্রদায়কে এরূপ ভাবে গঠিত করিয়া তুলিতেছে যে, ক্রমে ইহারা ধীর, শান্ত ও সুপ্রবীণ ব্যক্তিগণের সুপরামর্শ হইতে দূরে পড়িয়া উশৃঙ্খল ও অশাসিত হইয়া উঠিতেছে। যাহার যাহা ইচ্ছা তাহাই করিতেছে। এমন অবস্থায় ঘোষমহাশয়ের মৃত্যুতে তাঁর পরিবার পরিজন ও অন্যান্য সকলে যে

এত কাতর হইয়াছেন,তাহার প্রধান কারণ এই যে, তিনি এ কালের সম্পূর্ণ উপযোগী ছিলেন। তিনি যুবাজনের কেন, বালকটীর পর্য্যন্ত সম্মান করিয়া চলিতেন বলিয়া, উদ্ধত ব্যক্তিকে মিষ্ট কথায়, উগ্র-স্বভাব ব্যক্তিকে স্তব স্তুতি দ্বারা আয়ত্ব করিয়া আপনার বশে আনিয়া শেষে তাহার দ্বারা আবশ্যক মত কার্য্য করাইয়া লইতেন। প্রত্যেক লোককে তিনি আপন বশে রাখিতে পারিতেন, তাহার প্রধান কারণ, তাহার গোপন তত্ব এই ছিল যে তিনি অতি ধর্ম্ম-ভীরু লোক ছিলেন। কাহাকে কিরূপ ভাবে ধরিলে সেই ব্যক্তির ও তদ্দ্বারা অপর দশজনের কল্যাণ হয় সে তত্ব উপলব্ধি করিবার শক্তিই স্বতন্ত্র। দিব্যজ্ঞান লাভ ভিন্ন সে শক্তি জন্মে না। আজ-কাল যে প্রবীণদের প্রতি নবীনদের শ্রদ্ধা ভক্তির অভাব ও নবীন-দের প্রতি প্রবীণদের স্নেহমমতা ও শুভাকাঙ্ক্ষার অভাব দেখা যায়, তাহা কেবল সেই দিব্যজ্ঞানের অভাবে ঘটিতেছে। ঘোষমহাশয় জাপক ও যোগী ছিলেন। মৃত্যুকালে তাঁহার দক্ষিণ হস্ত জাপকের ন্যায় বক্ষঃস্থলে স্থাপিত ছিল। প্রাণবায়ু বহির্গত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার হস্ত শিথিল হইয়া পড়িল। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে মৃত্যুর কয়েক মিনিট পরে আবার সেই শিথিল হস্ত আপনা আপনি বক্ষঃস্থলে গিয়া ঠিক পূর্ব্বের মত স্থাপিত হইল এবং বামহস্তে করগ্রহণ করিলেন। সমবেত সকল লোক এই অদ্ভুত ব্যাপার দর্শন করিয়া এক বাক্যে তাঁহার সাধু-বাদ করিতে লাগিলেন। ঈশ্বর জানিত লোক বলিয়া সকলে তাঁহার গুণকীর্ত্তনে রত হইলেন। ঘোষমহাশয়ের মৃত্যু দর্শনে অনেকের পরলোকে বিশ্বাস জন্মিল, ধর্ম্মকর্ম্মে আস্থা, ন্যায়া-নুষ্ঠান ও সত্যাচরণে অনুরাগের সঞ্চার হইল। এরূপ চরিত্রের লোক সংসারে কয়জন মিলে যাঁহার জীবনে মরণে লোক পরমে-শ্বরের অনুগত হইয়া চলিতে উৎসাহিত হয়? তিনিই মহাত্মা

যাঁহার এতাদৃশ গুণগ্রাম সন্দর্শনে মুগ্ধ হইয়া যাহাকে দেবতা বোধে লোক ভক্তি করিয়া থাকে। ঘোষমহাশয় সেই শ্রেণীর লোক ছিলেন।

ত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

বিবাহের পূর্ব্বে।

বৃদ্ধ ঘোষ মহাশয়ের কঠিন পীড়ার সংবাদ পাইয়া অবিনাশও আসিয়াছিল। অবিনাশ আসিয়া দেখিল বৃদ্ধের অবস্থা বড় মন্দ, এ যাত্রা রক্ষা পাইবার আর কোন সম্ভাবনা নাই। সকলেই অতিমাত্র ব্যগ্রভাবে তাঁহার সেবায় নিযুক্ত। সকলের মধ্যে সরলার সেবাই অবিনাশের নিকট অত্যন্ত প্রশংসনীয় বলিয়া বোধ হইল। সরলা শান্তভাবে বসিয়া পাখার বাতাস করিতেছে, জল দিতেছে, বেদানা দিতেছে, ঔষধ খাওয়াইতেছে, মলমূত্রও পরিষ্কার করিতেছে, সকল কাজই করিতেছে, কিন্তু বিরক্তি নাই, গ্লানি নাই, অসন্তোষ নাই, মুখে কথাটী নাই। মনোরমা ও তাঁহার দিদি সরলার কর্ম্মপটুতা, শ্রমশীলতা, দৃঢ়তা ও কার্য্যতৎপরতা দেখিয়া যথেষ্ট প্রীত হইয়া তাহার আহারাদি ও স্বাস্থ্যের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিতেছেন। অবিনাশ এ সকল দেখিয়া মনে মনে গভীর আনন্দ অনুভব করিল। তার মা ও কাকীমা যে সরলার প্রতি এত অনুরক্ত ও স্নেহশীল হইয়া পড়িয়াছেন ইহাতে অবিনাশের আনন্দের সীমা রহিল না।

বৃদ্ধের মৃত্যুর পর অবিনাশ একদিন সরলাকে ক্ষণকালের জন্য নির্জ্জনে পাইয়া বলিল—সরলা, তুমি মা ও কাকীমার পোষা পাখী হইয়াছ? তাঁরা তোমাকে এত ভাল বাসিতে আরম্ভ

করিয়াছেন, তুমি ইহাদের ভালবাসা পাইয়া বেশ সুখে আছ, দেখিয়া প্রাণে খুব আনন্দ হইল। এখন আর বোধহয় আমার তিরস্কার,শাসন ও বাক্যগঞ্জনার জ্বালা সহ্য করিতে হইবে না—আর আমার সেই দুষ্টমিভরা ভালবাসারও প্রয়োজন হইবে না। আমি তোমাকে পূর্ব্বাপেক্ষা সুখের অবস্থায় দেখিয়া একটু নিশ্চিন্ত হইলাম। সরলা অবিনাশকে আসিতে দেখিয়াছে—দেখিয়া তাহার মাথা ঘুরিয়াছে, সুমধুর বসন্তের মৃদুমন্দ মলয়-হিল্লোলে যেমন কুসুম কাননের শোভা বৃদ্ধি করে, অবিনাশের নীরব প্রীতিপূর্ণ মধুরস্নিগ্ধ দৃষ্টিও তেমনি সেই ত্রয়োদশবর্ষীয়া দুঃখিনী বালিকার হৃদয়কোরক—অননুভূত প্রেমের ক্ষুদ্র কলিকাটী মুকুলিত করিয়াছে। কিন্তু সে ইহার বিন্দুমাত্রও কাহাকেও বুঝিতে দেয় নাই। সহিষ্ণুতাগুণে মনের ভাব মনেই লুকাইয়াছে। অবিনাশের স্নেহপূর্ণ ভ্রাতৃভাব যে তাহার উপস্থিত সুখশান্তি ও সকলের প্রিয়ভাজন হইবার প্রথম ও শেষ সোপান তাহা সে বেশ জানে। কিন্তু অবিনাশ দাদা আজ নিজের হাতে সেই সোপানাবলি ভাঙ্গিতে চাহিতেছে দেখিয়া সরলা থরথর করিয়া কাঁপিতে লাগিল। সরলার মুখে ভালমন্দ কোন কথাই বাহির হইল না, সরলা বসিয়া পড়িল। কৃতজ্ঞতাপূর্ণ কোমল দৃষ্টিতে অবিনাশের দিকে তাকাইয়া কাঁদিয়া ফেলিল। অবিনাশ আসিয়া সরলাকে ধরিল, ধরিয়া বলিল—সরলা, সরলা, আমার কথায় কষ্ট পে'লে। তুমি আজন্ম কষ্ট পাইতেছ, আবার তোমায় কষ্ট দিলাম। সরলা কান্দিতে কান্দিতে বলিল—মা বাবার ভালবাসা, জেঠাইমা ও জেঠামশাইয়ের আদরে ডুবে থাকলেও কি আমার তোমার ভালবাসা ও সদুপদেশের দরকার নাই? তুমিই যে আমায় এই পথে চলিতে শিখাইয়াছ! তোমার উপদেশ ও পরামর্শে চলিয়াইত আমি আজ সকলের স্নেহ ভালবাসার পাত্রী হইয়াছি। তুমি নিজে আমাকে

গড়িয়া পিটিয়া এখন মারিয়া ফেলিবে? মার, আমি তোমাকে চিরদিন দেবতা ভাবিয়া গোপনে গোপনে পূজা করিব, শিক্ষক ও গুরু ভাবিয়া ভক্তি করিব, পরম বন্ধু ভাবিয়া সকল বিষয়ে পরামর্শ চাহিব।

অবিনাশ দেখিল সরলা বাল্যভাব অতিক্রম করিয়া জীবনের নূতন রাজ্যে—নূতন চিন্তায়—নূতন ভাবে অঙ্গ ঢালিয়া ভাসিতে চলিয়াছে। তাহার কথাগুলি কেমন যেন অমিয়মাখা মধুর বীণা-ধ্বনিসদৃশ বোধ হইল—যৌবনসুলভ হৃদয়ের অজ্ঞাত—অননুভূত প্রেমকুসুম সকলকে যেন ফুটাইয়া দিল। অবিনাশ কম্পিত কলে-বরে সরলার হাত ছাড়িয়া দিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল, গমনোন্মুখ হইয়া বলিল—সরলা,আমি চিরদিন তোমাকে আমার করিয়া রাখিব। শিবপুরে গিয়া পড়াশুনা করিতে করিতে কতবার যে তোমার ঐ দুষ্টমিভরা মিষ্ট মুখখানি প্রাণের কোণে দেখা দিয়াছে, তাহার সংখ্যা হয় না। কতবার ভাবিয়াছি, তোমার কথা ভাবিব না, কিন্তু তোমার নীরব বিমর্ষ মুখখানি চুপে চুপে আমার প্রাণের কুটীরে দেখা দিয়া আমাকে ব্যস্ত ও বিব্রত করিয়াছে, কতবার তাড়াইয়া দিতে চেষ্টা করিয়াছি, কিন্তু এ হৃদয়পত্রে যে ছবি আঁকিয়াছি তাহা মুছিলে যায় না, ধুইলেও যায় না, অন্য কিছুতে ঢাকে না। কেবল তোমাকে জীবন্তভাবে সম্মুখে দেখিয়া সে ছবির অস্তিত্ব ভুলিয়া যাই। যাহাতে তোমার কোমল প্রাণে বেদনা লাগিবে, এমন কিছু করিব না।

একত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

অগ্নি পরীক্ষাতে।

ঘোষমহাশয়ের শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়া সম্পন্ন হইতে না হইতে, আমরা জানিনা কোন্ বিধিলিপির বিপাকে রামগোপাল বাবু পীড়িত হইলেন। চিকিৎসার কোনরূপ ত্রুটি না হইলেও তাঁহার সেবা শুশ্রূষার কোনরূপ ব্যতিক্রম না ঘটিলেও যেন কোন অলক্ষিত হস্ত চুপেচুপে তাঁহার প্রাণ-বায়ু হরণ করিল। তিনি স্বরবিকার রোগে প্রায় তিন সপ্তাহ কাল ক্লেশ পাইয়া শেষে নীরবে অন্ধকারের ক্রোড়ে লুক্কাইত হইলেন। অবিনাশ পিতৃহীন হইল। একমাসের বিদায় লইয়া বাড়ীতে আসিয়া মায়ের নিকট রহিল। বালক পিতৃকৃত্য শেষ করিয়া পড়া শুনার জন্য আবার শিবপুরে গমন করিল। কিন্তু রামগোপাল বাবুর মৃত্যুতে কাশীপুরের শান্তিকুটীর সেই যে সন্তপ্ত হইয়াছে, সেই যে সকলেই ভগ্ন হৃদয় ভগ্নমন হইয়া পড়িয়াছেন, আর কেহ কাহারও সহিত দেখা করেন না, কেহ কাহারও সহিত কথা কহেন না। কেবল মনোরমা দিনের অধিকাংশ সময় অবিনাশের মায়ের নিকট বসিয়া থাকেন। এমন ভাবে দিন কাটিতেছে যে দেখিলে বোধহয় এগৃহে যেন কেহ বাস করে না। ভুতের বাসা হইয়া আছে। দৈবাৎ একআধ জন লোক দেখিতে পাইলেও তাহা-দের ভাব গতিক দেখিয়া বোধহয় যেন প্রেতাত্মা দেহধারণ করিয়া ঐ গৃহের প্রাঙ্গণে অথবা পুষ্পোদ্যানে বিচরণ করিতেছে। শরৎচন্দ্র ও রামগোপাল বাবুর ক্ষুদ্র গৃহ এই যে শান্তি হারাইল, এই যে দেবভোগ্য শান্তি ও সুখপূর্ণ ক্ষুদ্রগৃহের শোভা ও সৌন্দর্য্য লোপ পাইল, কখন কি ইহার প্রতিবিধান হইবে না? আর কখন

কি এই শোকের অন্ধকারে আনন্দের ক্ষুদ্র প্রদীপটী জ্বলিবেনা ? আর কখন কি এই সংসার বিরহের সন্ধ্যায় পুনর্মিলনের ক্ষুদ্র আলো দেখা দিবে না ? প্রত্যুত্তরে ঐ প্রতিধ্বনি বলিতেছে, না—না—না। এ শোকবহ্নি কখন নির্ব্বাণ হয় না—এ দারুণ বিরহ যাতনা কখন জুড়ায় না—এ ঘন ঘোর বিষাদের মেঘ কখন কাটে না। কেবল তাহারই শোকের আগুন নিবিয়া যায়—তাহারই বিচ্ছেদে পুনর্মিলন হয়—তাহারই হৃদয়-আকাশ নির্ম্মল হয়, যে অসার ছাড়িয়া সার, চঞ্চল ছাড়িয়া ধ্রুব, যে কামনা ছাড়িয়া বিসর্জ্জন, যে আপনাকে ভুলিয়া পরমাত্মাতে মগ্ন হয়, সেই ব্যক্তিই কেবল সংসার বিরহের তীব্র দাবদাহ সহ্য করিয়া, অনন্ত দুঃখ কষ্টের ডালি মাথায় তুলিয়া লইয়া, তীব্র হলাহলপূর্ণ পানপাত্র চুম্বন করিয়াও সুখ পায়, আরাম পায়, শান্তি অনুভব করে।

অবিনাশের পিতৃবিয়োগে, তার মায়ের বৈধব্যে মনোরমার কোমল হৃদয় একেবারে ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। তিনি জানেন, সংসারধর্ম্ম পালন করিতে স্বামীই পরম সহায়। কোটী তারার উদয় হইলেও পূর্ণচন্দ্রের অভাবে অমাবস্যার রাত্রি যেমন শোভাহীন, শত আত্মীয় পরিবেষ্টিত হইয়াও বিধবার নিরাশময় জীবনও সেইরূপ সৌন্দর্য্য বিহীন হয়, ভগ্ন কাচখণ্ডের ন্যায় তাহা অব্যবহার্য্য হইয়া পড়ে। তবে প্রেমমালার দীক্ষায় দীক্ষিত হইতে পারিলে, সে স্বতন্ত্র কথা। অবিনাশের মায়ের গভীর শোক ও যন্ত্রণার প্রকোপ কথঞ্চিৎ হ্রাস হইবে আশা করিয়া প্রেমমালা শান্ত্বনাপূর্ণ একখানি পত্র লিখিয়াছেন। সে বিস্তৃত পত্রের একস্থানে আছে—"রামচন্দ্রের সম্মুখে সীতার অগ্নিপরীক্ষা সহজ হইতে পারে, মৃতপুত্র ক্রোড়ে শৈব্যার শ্মশান-প্রবেশও সহজ হইতে পারে, চীরবাসে নলকর্ত্তৃক পরিত্যক্ত দময়ন্তীর অন্তর্দাহও সহজ হইতে পারে, ভগিনী, আপনার ন্যায় সাধ্বীর বৈধব্য-যন্ত্রণা তদ-

পেক্ষা শতগুণে ভীষণতর, তীব্রতর ও শোকপূর্ণ সত্য কিন্তু তবুও আপনি শান্ত হউন। ব্রতধারিণী সাবিত্রীচরিতই আপনার অনুকরণের উপযুক্ত। পতিপূজাই আমাদের পরম গৌরব, সেই পূজায় যেন আপনার ও আমার বলিদান হয়। আপনি আমার সমবয়স্কা হইলেও আপনাকে বড় ভগ্নীর মত শ্রদ্ধা করি। আপনার ছোট বো'নটী যে সংসারে এত কষ্ট সহ্য করিয়া দাঁড়াইয়া আছে, ইহা স্মরণ করিয়া আপনি শান্ত হন ইহাই আমার একমাত্র অনুরোধ। পতিসোহাগিনীর বৈধব্যজনিত তুষানলই তাহার পরম শান্ত্বনা—পরম সম্পদ—স্বর্গসুখ।"

মনোরমার দায়িত্ব শতগুণে বৃদ্ধি হইল। তিনি নিজে যাঁহার বাটীতে আসিয়া আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। চিরদিন যাঁহাদের নিকট কৃতজ্ঞতাঋণে আবদ্ধ থাকিতে হইবে। যাঁহাদের আত্মীয়তা ও স্নেহমমতা, হেমন্তের শিশির-বিন্দুর ন্যায় অলক্ষিতভাবে, তাঁহাদের সুখপূর্ণ সংসারধর্ম্মকে পরিপুষ্ট করিয়াছে, আজ সেই অবিনাশের মায়ের আশ্রয় ও অবলম্বন স্বরূপ হইতে হইতেছে—ইহাই চিন্তা করিয়া মনোরমা আরও অধিকতর কাতর ও চিন্তিত হইয়া পড়িয়াছেন। তিনি বুঝিয়াছেন সকল প্রকার কর্ত্তব্য কর্ম্মের একটী সীমা আছে—পূর্ণরূপে সে সকল কর্ত্তব্য সম্পন্ন করিতে না পারিলেও মার্জ্জনা আছে, কিন্তু এই পতিবিয়োগ-বিধুরা অনাথা বিধবার প্রতি তাঁহার কর্ত্তব্য শেষ হইবার নহে। রাবণের চিতানলের ন্যায় চিরদিনই এই বিধবার প্রতি তাঁহার কর্ত্তব্যজ্ঞান নিষ্ঠার সহিত উজ্জ্বল রাখিতে হইবে। অনেক কাজে কৃতকার্য্য হইয়া তাঁহার প্রাণে যে একটু আত্মপ্রসাদের সঞ্চার হইতেছিল, এই ভীষণ পরীক্ষার চিন্তানলে সে ক্ষুদ্র আত্মপ্রসাদের কণিকা ভস্মীভূত হইল—তিনি দেখিলেন মানুষের ক্ষুদ্র শক্তি সামর্থ্যের সাহায্যে এ অবস্থায় জয়লাভের সম্ভাবনা নাই। মাটীতে

না মিশিলে, পায়ের, ধূলা না হইলে, আপনাকে একবারে বিক্রয় না করিলে, অথবা আপনাকে সম্পূর্ণরূপে জয় করিতে না পারিলে আর এ অগ্নিপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার সম্ভাবনা নাই। নিরন্তর আত্মপরীক্ষাসহকারে অবিনাশের মায়ের সেবা শুশ্রূষা ও তাঁহার চিত্তবৃত্তি সকলের কুশল সম্পাদনে নিযুক্ত রহিয়াছেন। এখন হইতে মনোরমা তাঁহার দিদিকে সংসারের সকল প্রকার কাজে প্রধান স্থান দিয়া চলিতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন, কিন্তু অবিনাশের মা দিন দিন সংসারের কাজে অধিকতর উদাসীন হইয়া পড়িতেছেন। তাঁহার ইচ্ছা অবিনাশ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া একটী কর্ম্ম কাজ পাইলেই, তিনি সংসার-বন্ধন ছিন্ন করিয়া পুণ্যক্ষেত্র কাশীধামে গিয়া বাস করেন।

দ্বাত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

পরিণয়ে।

রামগোপাল বাবুর মৃত্যুজনিত শোকের তীব্র প্রকোপ ক্রমশঃ হ্রাস হইল বটে, কিন্তু অবিনাশের মায়ের ভগ্নহৃদয় আর গড়িল না। সে বিষাদভরা মুখে আর প্রসন্নতাপূর্ণ মধুর হাসির বিন্দুমাত্রও কখন দেখিতে পাওয়া যায় না, কলের পুতুলের মত উঠা বসা, চলা ফেরা করেন। নিতান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও মনোরমার অনুরোধ ও পীড়াপীড়িতে বাধ্য হইয়া কখন কখন আত্মীয় স্বজনের বাড়ীতে গিয়া থাকেন। আপাততঃ এইভাবেই জীবনের দিন কাটাইবেন এইরূপ স্থির করিয়াছেন।

এখন সরলাই তাঁহার প্রধান সহায়, সরলা তাঁহার সেবা

শুশ্রূষা করে, রাত্রে তাঁহার নিকটে থাকে, সে বালিকার দেহের সমস্ত সামর্থ্য, মনের সকল শক্তি, হৃদয়ের পূর্ণ অনুরাগ সহকারে তাঁহার আদেশ পালনে নিজেকে নিযুক্ত করিয়াছে। তিনিও সরলার অকপট ভক্তি ও অনুরাগে আকৃষ্ট হইয়া ক্রমশঃ তাহাকে কন্যার ন্যায় স্নেহ করিয়া এবং সকল কাজ করিতে বলিয়া তৃপ্তি অনুভব করিয়া থাকেন। এইরূপে কিছু দিন চলিয়া গেল। এমন সময়ে মনোরমা ও শরৎচন্দ্র পরামর্শ করিয়া অবিনাশের বিবাহের কথা পাড়িলেন। অবিনাশের বিবাহের প্রস্তাব উপস্থিত করায় বিধবা জননী অশ্রুপূর্ণ নয়নে বলিলেনঃ—যাঁহার কাজ তিনি ত আর সংসারে নাই, আমি আর কি বলিব? যাহা ভাল বোধ হয় তোমরাই কর। ঠাকুরপোকে বল, আমি তোমাকে, বিশেষভাবে তাঁহাকে এ কার্য্যের ভার দিলাম। তোমরা যাহা করিবে তাহাতে আমার কোন আপত্তি থাকিবে না। সরলার সম্বন্ধে আমার পূর্ব্বে যে আপত্তি ছিল, তাহা আর নাই। সে তাহার আচরণ দ্বারা আমাকে সম্পূর্ণরূপে জয় করিয়াছে, এখন আমি তাহাকে কন্যা বা বধূভাবে গ্রহণ করিতে আপত্তি করিব না।

শরৎচন্দ্র ও মনোরমা পরামর্শ করিয়া সরলার সঙ্গেই অবিনাশের বিবাহ স্থির করিলেন। বিবাহে আত্মীয় স্বজন সকলকেই নিমন্ত্রণ করিলেন। শরতের এই প্রথম কাজ, তাই একটু বেশী আয়োজন করিয়াছেন। পালিতা হইলেও সরলাকে তাঁহারা নিজ কন্যার ন্যায় অকৃত্রিম স্নেহ ও ভালবাসার চক্ষে দেখিয়া তৃপ্তি অনুভব করিয়া থাকেন। অবিনাশের সহিত সরলার বিবাহ হইতেছে, মনোরমা আনন্দে আটখানা হইয়া পড়িয়াছেন। কন্যা উপযুক্ত পাত্রে পড়িলে, মায়ের প্রাণে যে সুখ হয়, মনোরমা আজ সেই সুখে সুখী। একটী সুশিক্ষিত, সচ্চরিত্র, সরল, অমায়িক যুবকের সহিত একটী সুশীলা সুবালার পরিণয়ের যে পরিণাম,

শান্তিপ্রিয় লোক মাত্রেই তাহার চিন্তাতে সুখানুভব করিয়া থাকেন। সরলা ও অবিনাশকে যাঁহারা জানেন, তাঁহারা আজ বাস্তবিকই সেই সুখ অনুভব করিতেছেন।

শাস্ত্রে বলে কন্যা সুপাত্রে পরিণীত হইলে পূর্ব্বপুরুষগণ প্রসন্ন হইয়া আশীর্ব্বাদ করেন, তাঁহাদের প্রীতার্থে এরূপ শুভানুষ্ঠানের পূর্ব্বে বৃদ্ধি-শ্রাদ্ধ হইয়া থাকে। শুনা যায় সুস্বভাবসম্পন্ন, ধর্ম্মনিরত যুবকের সঙ্গে কোমল স্বভাবা, চারুশীলা, মৃদুভাষিণী, মধুরহাসিনী, লজ্জাশীলা কুমারীর পরিণয়ে দিক সকল প্রসন্ন হয় ও দেবতারা শুভদৃষ্টি করেন। যিনি চরাচর বিশ্বের একমাত্র অধিপতি, ভূত,ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান নিয়ত যাঁহার দৃষ্টিপথে দণ্ডায়মান, মঙ্গল ও শান্তি স্থাপনই যাঁহার অনাদি অনন্ত অভিপ্রায়, সেই মঙ্গলময় বিধাতা পুরুষ স্বয়ং উপস্থিত থাকিয়া পুরুষ ও রমণীর এরূপ মধুর মিলন সাধন করেন। যাহারা সংসারে এরূপ স্বর্গীয় পবিত্র মিলনে মিলিত হয়, তাহারা যেমন একদিকে চিরজীবন সুখী হয়, অপরদিকে, তাহাদের মিলনের সুবাতাস যতদূর প্রবাহিত হয়, ততদূর শান্তি ও সুখপূর্ণ করিয়া তুলে, আর সেই জন্যই ভূতভাবন ভগবান সে শুভসংসাধনে পরিতুষ্ট হইয়া তাহাদিগকে আশীর্ব্বাদ করিয়া থাকেন।

আজ বৈশাখের পৌর্ণমাসী সন্ধ্যার শুভসমাগমে যখন আকাশ ও পৃথিবী হাসিতে লাগিল, বসন্তের মৃদু মন্দ মধুর হিল্লোল জ্যোৎস্নাকণাসকল বহন করিয়া যখন কুসুমকাননের সৌরভভারকে স্নিগ্ধ করিতে লাগিল, জড় চেতনে—চেতন জড়ে মুগ্ধ হইয়া যখন হাসিল, সেই শুভ মুহূর্ত্তে, সেই হাসির তরঙ্গের হিল্লোলে সিক্ত হইয়া সরলা প্রজাপতির আদেশে অবিনাশের হাতে তাহার ক্ষুদ্র কোমল হাতখানি রাখিল, অবিনাশ অতি সাবধানে ও অতি যত্নের সহিত সেই চম্পকগুচ্ছসদৃশ কোমল সুন্দর

হাতখানি ধরিলেন, পুরোহিত সচন্দন পুষ্পমালাদ্বারা দুখানি হাত এক করিলেন, পুরাঙ্গনারা হুলুধ্বনিসহকারে মঙ্গল-আনন্দ-ধ্বনি করিলেন। সকলে আনন্দে মগ্ন হইল। সংসারে দেবদুর্ল্লভ স্বর্গের ছবি দেখা দিল। অনেক দিনের পর কাশীপুরের শান্তি-কুটীর [illegible] হাসিল, হাসিল বটে, কিন্তু অবিমিশ্র সুখ—অক্ষুণ্ণ শান্তি—অপ্রতিহত হাসির তরঙ্গ কখন দীর্ঘকাল স্থায়ী হয় না। সুখের [illegible] কণার অন্তরালে দুঃখের তীব্র জ্বালা যেমন লুকাইয়া থাকে, শান্তির প্রীতিপ্রদ অনুভূতির পশ্চাতে অনেক সময়ে যেমন অশান্তির অগ্নিকুণ্ড জ্বলিতে থাকে, মধুমাখা হাসির অট্ট উচ্ছ্বাসের পরক্ষণে যেমন চারিদিক নীরব—নিশ্চল—থমথ'মে ভাব ধারণ করে, সহসা আজ এই উৎসবপূর্ণ গৃহ-প্রাঙ্গণও সেইরূপ নিরানন্দের পরিচ্ছদ পরিধান করিল। পতিবিয়োগবিধুরা বিধবার শোকসন্তপ্ত হৃদয়ের তীব্র জ্বালা তীব্রতর আকার ধারণ করিল। সুখকণা দুঃখাগ্নিতে দগ্ধ হইয়া ভস্মে পরিণত হইল, আনন্দধারা নিরানন্দের আঁধারকূপে ডুবিয়া গেল। রামগোপাল বাবুর অমায়িকতা, মিষ্ট কথা, সৌজন্য স্মরণ করিয়া সকলেই আজ বিষণ্ণ মুখে নীরবে দণ্ডায়মান। সংসারে বিধাতার ব্যবস্থাই এইরূপ।

সম্পূর্ণ